ISSN 1813-0372

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, লেখক ও গবেষকবৃন্দ, ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সংস্থার ফোন নাম্বার বদল হয়েছে। বর্তমান নাম্বার : ০২-৯৫৭৬৭৬২

সংস্থার ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে

web: www.ilrcbd.org ভিজিট করুন এবং মতামত দিন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালটি বরাবরের মত এবারও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত ছয়টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজ, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলিমগণ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তারই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলোতে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধকারগণ উদার মন নিয়ে সমস্যাগুলোর চিত্র তুলে ধরে ইসলামের দৃষ্টিতে তার সমাধান উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, লেখাগুলো পাঠক-পাঠিকাগণের মনের খোরাক যোগাবে।

ইসলামের ইতিহাসে উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ঐতিহাসিকগণ তার সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে তাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ আখ্যা দিয়েছেন। মুসলিম মনীষীগণ তাকে মুজাদ্দিদে কামিল (সফল সংস্কারক)-এর মর্যাদা দিয়েছেন। খিলাফতে রাশেদার পরে উমাইয়্যা শাসনামলের ষাট বছরে পবিত্র ইসলামের সর্বদিকে যথা : চিন্তা-চেতনা, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, ব্যক্তি ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় যত জঞ্জাল পুঞ্জিভূত হয়েছিল এর সবই তিনি তার মাত্র আড়াই বছরের খিলাফতকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন। এই মহান মুজাদ্দিদ রাষ্ট্রনায়কের জীবনের সর্বদিকে রয়েছে সকল মানুষের জন্য শিক্ষার উপাদান। জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধেই তার বিচারব্যবস্থা ও ফিকহি ইজতিহাদ-এর একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঠকদের চিন্তা ও জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করবে।

বিবাহ হলো একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা; যা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে দেয়, যার মাধ্যমে তারা সমাজে বৈধভাবে বসবাস করতে পারে। সুদূর অতীতকাল থেকেই মানবসমাজে বিবাহ পদ্ধতি চলে আসছে। তবে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নভাবে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তেও বিবাহের কিছু নিয়মকানুন রয়েছে যা না হলে বিবাহ বৈধ হয় না। যেমন একজন মুসলিম নারী একজন মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারে, তবে কোন অমুসলিমকে বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ একটি মহল বিভিন্ন যুক্তির আড়ালে এধরনের বিবাহকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টায় মেতে ওঠেছে। ফলে সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান কী তা জানতে সচেতন মানুষের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। "মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ : শরয়ী বিধান" শিরোনামের প্রবন্ধটিতে বিষয়টি চমৎকারভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সে সকল সামাজিক অপরাধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে তার মধ্যে একটি হলো পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মেশানো। এদেশের বাজারগুলো এখন ভেজাল পণ্যে সয়লাব। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র এমনকি ওষুধেও ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ফলে জনজীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। পণ্যে ভেজাল মেশানো যে ইসলামী বিধান মতে ঘৃণ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। "পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের বিধান উপস্থাপন করেছেন।

আজকের শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ তাদের শিশুদেরকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো রাষ্ট্র, সমাজ ও পিতা-মাতার অবহেলার কারণে শিশুরা চরম চারিত্রিক অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। আমরা আমাদের দেশে প্রতিদিনই শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের নানা ঘটনা জানতে পারি। অভিভাবকগণকে নিজেদের শিশু-সন্তানকে নিয়ে সবসময় দুবর্ভাবনায় থাকতে হয়। "শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখকদ্বয় বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তারা ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু কারা তা নির্ধারণ করেছেন। তারপর শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে কুরআন ও সুন্নাহর দিক নির্দেশনা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পাঠকগণ প্রবন্ধটি পাঠ করে নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অবগত হবেন বলে আমরা মনে করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী জাতির অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও ইসলামে নারীদের অধিকার রয়েছে। তবে নারীর সাক্ষ্যদানের বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দিক নির্দেশনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক যুগেও এ বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ "ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য" শিরোনামে বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হয়েছে যা পাঠ করলে নারীর সাক্ষ্যদান বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যাবে।

"ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের আইনী ব্যবস্থা" শিরোনামের প্রবন্ধটিতে ইভটিজিং সম্পর্কিত দেশীয় ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী আইনের উপযোগিতা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী আইন ও অনুশাসন কীভাবে এবং কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে আলোচ্য প্রবন্ধে তা উপস্থাপিত হয়েছে।

জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় "আহকামুস সুজানা ওয়া হুকুকুহুম ফিল ফিকহিল ইসলামী" (ইসলামের কারাআইন ও কারাবন্দিদের অধিকার) শিরোনামে সিরিয়া-লেবানন থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা গ্রন্থের রিভিউ প্রকাশ করা হয়েছে। রিভিউয়ার বেশ কষ্ট স্বীকার করে এ বিষয়ের ওপর নতুন এ গ্রন্থটির সাথে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ল' রিসার্চ সেন্টার থেকেই প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

মোটকথা, অতীতের ন্যায় বর্তমান সংখ্যার সবগুলো প্রবন্ধে সমকালীন কিছু সমস্যার চিত্র উপস্থাপন করে তার সমাধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবগুলো প্রবন্ধ গবেষণাধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক। এগুলো পাঠ করে পাঠক-পাঠিকাগণ অনেক জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবেন বলে আমার আশা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন!

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্‌হি ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা

রাশীদাহ্ *

*[**সারসংক্ষেপ :** ইসলামের ইতিহাসে খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ. একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নাম। খিলাফতে রাশেদার ইতিহাসের প্রথম পর্যায় আলী রা-এর জীবনাবসানে পরিসমাপ্ত হলেও উমর ইব্ন আবদুল আযীয রা.-এর খিলাফতে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। সেজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা[১] বলে আখ্যায়িত করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর শুরু হয় বানূ উমাইয়্যার শাসনকাল। তাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। তবে এ সময় মুসলিম উম্মাহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি বিচার ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। ফলে পরিবর্তন সময়ের অনিবার্য দাবী হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ. যুগের লাগাম টেনে ধরে একে সাহাবা কিরাম রহ.-এর যুগের সাথে মিলিয়ে দেন। আর এ কাজটি সম্পাদনের জন্য তাঁকে অসংখ্য সংস্কার কার্যক্রম অত্যন্ত ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে পরিচালিত করতে হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজ আদল ও ইনসাফে ভরে যায়। এক্ষেত্রে তাঁর সময়ের বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর বিচার ও ফিক্‌হি ইজতিহাদ আধুনিক যুগের অনেক সমস্যার সমাধান করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই, আলোচ্য প্রবন্ধে উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহি ইজতিহাদের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।]*

উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর জীবন পরিক্রমা

নাম উমর, ডাকনাম আবু হাফস। পিতা আব্দুল আযীয ইব্ন মারওয়ান, মাতা উম্মু আসিম।[২] তিনি মিসরের নীল নদের তীরে হুলওয়ান নামক গ্রামে হিজরী ৬১ অথবা

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা ক্যাম্পাস, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. বিশিষ্ট তাবি'ঈ সুফইয়ান আছ-ছাওরী রহ. বলেন,

الْخُلَفَاء خَمْسَةٌ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

"খলীফাগণের সংখ্যা পাঁচ : আবু বকর, উমর, উছমান, আলী ও উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.।" ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফীত তাফদীল, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং-৪৬৩৩; আছারটির সনদ যঈফ (ضعيف) ও মাকতু (مقطوع); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৬৩১

২. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, *তাবি'ঈদের জীবনকথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বি.আই.সি) প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, খ. ২, পৃ. ১৩

৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] শৈশবকালের অধিকাংশ সময় মদীনায় অতিবাহিত করেন। এ সময় বড়-বড় জ্ঞানী-গুণীদের দারসে বসা ও সাহচর্য লাভের কারণে তিনি বহু শাস্ত্রে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি হিজরী ৮৭ সন থেকে ৯৩ সন পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মদীনা, মক্কা ও তায়িফের ওয়ালীর (গভর্নর) দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে দিমাশকে (দামেস্ক) চলে আসেন এবং দীর্ঘ চার বছর (৯৩-৯৬) সেখানে অতিবাহিত করেন। হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের ১১ তারিখ শুক্রবার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম জাহানে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল তিনি তা দূর করে আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত করেন। শাহী দরবারী রীতি বর্জন,[৫] ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ,[৬] মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) গঠন,[৭] রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ আমানতদারী,[৮] শান্তি ও সংস্কার নীতি অনুসরণ,[৯] সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি উদার আচরণ[১০], অনারব মুসলিমদের প্রতি সদয়,[১১] অসংখ্য জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন[১২] ও খিলাফতে রাশেদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক অভাবনীয় সংস্কার কার্যক্রম গোটা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর ২ বছর ৫ মাস[১৩], মতান্তরে ২ বছর ৬ মাসের

---

৩. আলী ফাউর, *সীরাতু ইবন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, বৈরুত : দারুল হাদী, ১ম সং, ১৯৯১, পৃ. ১৩।

৪. ইবন আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, *আল-ইকদ আল-ফারীদ*, কায়রো : মাতবাআতু লুলাজনা আত-তালীফ ওয়াত তারজমা, ৩য় সং, ১৯৬৯, খ. ৪, পৃ. ৪৩২

৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৪৪৭-৪৪৯; আহমাদ মামুর আল-উসায়রী, *আ'জামু 'উজামা আল-মুসলিমীন মিন কুল্লি কারানিন*, আদ-দাম্মাম : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়্যা, ১ম সং, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৩

৬. আল-উসায়রী, *আ'জামু 'উজামা আল-মুসলিমীন মিন কুল্লি কারানিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; ইবনুল জাওযী, *সীরাত ওয়া মানাকিব আমিরিল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, তাহকীক : হামেদ আহমাদ আত-তাহির, কায়রো : আল-মাকতাব আস-সাকাফী, ২০০৪, পৃ. ১০২, ১০৫; ইবন সা'দ *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৬।

৭. আলী ফাউর, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৮. ইবনুল জাওযী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৯. ড. আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবী, *উমর ইবন আবদুল আযীয মা'আলিমুত তাজদীদ ওয়াল ইসলাহ আর-রাশিদী আলা মিনহাজিন নুবুয়্যাত*, মিসর : দারুত তাওযী ওয়ান নাশরী আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ১৩৪-১৩৫

১০. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূআত, ১৯০১, পৃ. ১৩০।

১১. আল-উসায়রী, *আ'জামু 'উজামা আল-মুসলিমীন মিন কুল্লি কারানিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

১২. ইব্‌নুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, বৈরুত : দারু সাদির, ১৯৮৬, খ. ৫, পৃ. ৬০; আলী ফাউর, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৩. ইমাম আন-নাওয়াবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ১৮

শাসনকাল গোটা মুসলিম উম্মাহকে আবার খিলাফতের দিকে নিয়ে যায়।[১৪] ভাবী খলীফা ইয়াযিদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এক খাদেমের মাধ্যমে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-কে বিষ পান করান। বিষের প্রতিক্রিয়ায় একাধারে বিশ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর তিনি ১০১ হিজরীতে ৩৯ বছর এক মাস, মতান্তরে ৪০ বছর এক মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫] তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আব্বাসীয় খলীফা মামূন আর-রশীদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, "এই একটি মাত্র ব্যক্তির কারণে বানূ উমাইয়্যা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।"[১৬]

বিচার ব্যবস্থা

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর ছিল গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতা, যা তাঁকে ইসলামী শরী'আতের প্রাণসত্ত্বা বুঝতে ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে "মুজতাহিদ-ইমাম" অভিধায় ভূষিত করা হয়। তিনি তাঁর ইজতিহাদের জ্ঞান দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান এবং অনেক ফিকহী মাস'আলা বের করেন। তাঁর সময়ের বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্‌হি ইজতিহাদ থেকে ইসলামী আইনের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সমসাময়িক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর গৃহীত বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্‌হি ইজতিহাদ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বিচারকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ

বিচারক সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একজন সেনাপতি। যার উপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের 'আদল ও ইনসাফ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই একজন বিচারকের জন্য অপরিহার্য কিছু গুণাবলী থাকা আবশ্যক। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. বলেন,

> خمس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهيما وأن يكون حليما وأن يكون عفيفا وأن يكون صليبا وأن يكون عالما يسأل عما لا يعلم
>
> বিচারক যদি পাঁচটি গুণ অর্জন করতে ভুল করেন, তাহলে তার ভিতরে কালিমা থেকে যায়। গুণগুলো হলো, বোধ সম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া, ধৈর্যশীল হওয়া, সচ্চরিত্রবান হওয়া, দৃঢ় হওয়া এবং জ্ঞানী হওয়া, আর যা জানেন না তা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া।[১৭]

---

১৪. আবুল হাসান আলী আল-হুসাইনী আন-নাদবী, *রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া ফী আল-ইসলাম*, বৈরুত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সং, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৫৮

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ২০০৭, খ. ৬, পৃ. ১৬৬

১৬. ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, *তাবি'ঈদের জীবনকথা*, খ. ২, পৃ. ৯

১৭. ইব্‌ন সা'দ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯-৩৭০; মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররম ইব্‌ন মানযুর, *মুখতাছারু তারীখু দিমাশক*, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, খ. ৭, পৃ. ৬২৩; ইব্‌ন আব্দি রব্বিহি, *আল-ইকদ আল-ফারীদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. বিচারকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বলেন,

> لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوى الرأي، ولا يبالي ملامة الناس
>
> কারো বিচারক পদে আসীন হওয়া সমীচীন নয়, যে যাবত না তার মধ্যে পাঁচটি গুণ পাওয়া যায়। এ গুণগুলো হলো - ১. নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া, ২. ধৈর্যশীল হওয়া, ৩. পূর্ববর্তী বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, ৪. জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সাথে পরামর্শ করা ও ৫. মানুষের তিরস্কার ও সমালোচনার ব্যাপারে কাউকে পরোয়া না করা।[১৮]

উল্লেখ্য, খুরাসানে কাযী হিসেবে নিয়োগদানের জন্য উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আবু মিজলায রা.-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বললেন, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত। সে এর উপযুক্ত নয়। আবার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক? বললেন, দ্রুত রেগে যায়, মোটেই খুশী হয় না। প্রচুর চায়, খুব কম বিরত হয়। ভাইকে হিংসা করে, পিতার সাথে পাল্লা দেয় এবং দাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, অমুক? বললেন, সমকক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করে, শত্রুর সাথে শত্রুতা করে এবং যা খুশী তাই করে। উমর রহ. মন্তব্য করেন, এদের কারো মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[১৯] এ থেকে বুঝা যায়, বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

বিচারের নীতিমালা

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, এর সহজলভ্যতা ও ন্যায়বিচারের সুফল জনগণের নিকট নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন এসব নীতিমালা পালন করা একজন বিচারকের জন্য অপরিহার্য। নিম্নে এ নীতিমালা তুলে ধরা হলো :

১. ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে অথবা লোভ দেখিয়ে সাক্ষীকে দিয়ে সাক্ষ্য নেওয়া অবৈধ। কেননা, সত্য-সঠিকভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করার পূর্বশর্ত হলো সাক্ষ্য ও প্রমাণ। তিনি নিজে একটি মামলার একজন সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী (গভর্নর) ও বিচারকদেরকে এ মর্মে পত্রে লেখেন-

---

১৮. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯

১৯. ইবনু 'আব্দি রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ. ১, পৃ. ৫

فأيما رجل آذى شاهد عدل فاضربه ثلاثين سوطا، وقفه للناس.

কোন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকে কেউ কষ্ট দিলে তাকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করুন এবং মানুষদের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখুন।[২০]

২. কোন রকম সন্দেহ-সংশয় নিয়ে রায় না দেওয়া । এমন হলে বিচার উর্ধ্বতন কারো নিকট প্রেরণ করা। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান রা. জাজিরার বিচারক থাকা অবস্থায় এরকম একটি অবস্থার কথা তাঁকে জানালে জবাবে তিনি লেখেন-

আমি তোমার কাজে সহযোগিতা ছাড়া কোন কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না। তোমার নিকট যা সত্য মনে হবে সেভাবে তুমি রায় দিবে। আর যা কিছুর ভেতর সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেগুলো আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে।[২১]

৩. প্রমাণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং রাগান্বিত অবস্থায় রায় না দেওয়া। হাফিয যাহাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه

তিনি যখন কোন লোককে শাস্তি দিতে চাইতেন, তখন তাকে কমপক্ষে তিন দিন বন্দী রেখে পর্যবেক্ষণ করতেন। কারণ তিনি প্রথম রাগেই শাস্তি দেওয়া অপছন্দ করতেন।[২২]

৪. উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. বলতেন,

إن الملك إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

ভুল করে শাস্তি দেওয়া থেকে ভুল করে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।[২৩]

---

২০. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৫

২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররম ইব্‌ন মানযুর, *মুখতাছারু তারীখু দিমাশক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৯১

استعمل عمر بن عبد العزيز ميمون بن مهران على الجزيرة، على قضائها وخراجها، فكتب إليه ميمون يستعفيه، وقال: كلفتني ما لا أطيق، أقضي بين الناس، وأنا شيخ كبير ضعيف رقيق.

فكتب إليه عمر: اجب من الخراج الطيب، واقض بما استبان لك، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلي، فإن الناس لو كانوا إذا كبر عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا دنيا.

وقيل: إن عمر كتب إليه: إني لم أكلفك تعباً في علمك ولا في جبايتك، فاجب ما جبيت من الحلال، ولا تجمع للمسلمين إلا الحلال الطيب.

২২. ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭, খ. ৭, পৃ. ১৯৮; ইমাম আস-সূয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, মিসর : ১৩৫১, খ. ১, পৃ. ২০১

২৩. ইবনুল জাওযী, *সিরাত ওয়া মানাকিব আমিরিল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৫. শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া অবৈধ। তবে যদি কেউ কসম করে দায়িত্ব নেয়, তবে তার উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া যাবে।[২৪]

৬. খলীফা, গভর্নর ও বিচারকদের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা ঘুষ। এ কারণে ফুরাত ইব্ন মুসলিম রহ. তাঁকে হাদিয়া দিলে তিনি নিতে অস্বীকার করেন, তখন ফুরাত রহ. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন- রাসূলুল্লাহ স., আবু বকর, উমর রা. কি হাদিয়া গ্রহণ করতেন না? উত্তরে তিনি বলেন,

إنما لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة

এটা তাঁদের জন্য হাদিয়া ছিল। তাঁদের পরবর্তী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এটা ঘুষ।[২৫]

৭. শরী'আতের বিরুদ্ধে গেলে বিচার প্রত্যাহার করে নেওয়া। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। ইমাম শাফিয়ী রহ. তাঁর নিজস্ব সনদে মাখলাদ ইব্ন খুফাফ রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

আমি একটি দাস খরিদ করে কিছু আয়ের জন্য তাকে কাজে লাগালাম। কয়েকদিন পর দাসটির দোষ ধরা পড়লো। বিক্রেতার সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া হলো। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-কে বিচারক মানলাম। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে দাসটি এবং আমার যিম্মাদারিতে থাকা অবস্থায় তার আয়ের অর্থ ফেরত দানের জন্য নির্দেশ দিলেন। অপরদিকে বিক্রেতাকেও নির্দেশ দিলেন মূল্য ফেরতদানের জন্য। এরপর আমি গেলাম উরওয়া ইব্ন যুবাইর রা.-এর নিকট এবং তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি আজ সন্ধ্যায় উমারের নিকট যাবো এবং তাকে জানাবো যে, 'আয়িশা রা. আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. এমনই একটি বিচার করেছিলেন এবং তাঁর রায়ে বলেছিলেন, "যিম্মাদারীর কারণে আয় পাবে যিম্মাদার বা ক্রেতা।"[২৬] কারণ, এ সময়ে দাসটি মারা গেলে বিক্রেতার উপর কোন কিছু

---

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৭
সহীহুল বুখারীতে উমার ইবনু আবদিল আযীয রহ.-এর উপর্যুক্ত কথাটি এভাবে এসেছে- كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم هدية واليوم رشوة-"রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে হাদিয়া (প্রকৃত অর্থে) হাদিয়া-ই ছিল, আর বর্তমানে তা ঘুষে রূপ নিয়েছে।" ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হিবাহ, অনুচ্ছেদ : মান লাম ইয়াক্বালিল হাদিয়াতা লি-'ইল্লাতিন।)

২৬. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আহমদ মুহাম্মদ শাকের, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফীমান ইয়াশতারিল আবদা, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৫৮১, হাদীস নং-১২৮৫। হাদীসটির সনদ হাসান (حسن); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু তিরমিযী*, হাদীস নং-১২৮৫
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج بالضمان

বর্তাতো না; সবটুকু ক্ষতি হতো ক্রেতার। আমি আবার উমারের নিকট গেলাম এবং তাঁকে উরওয়ার মুখে শোনা কথা আয়িশা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিচার ও রায়ের কথা জানালাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি যে বিচার করেছি, তাতে সত্য ছাড়া আর কিছুই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন আমার নিকট রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ পৌঁছেছে। আমি উমারের সিদ্ধান্ত বাতিল করছি এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর উরওয়া তার কাছে যান। অতঃপর আমাকে দাসের আয় গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[২৭]

৮. প্রমাণ পেলে রায় পরিবর্তন করা। বিচার কাজ পরিচালনা ও রায় দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভীষণ বিনয়ী। রায় দানের পরেও ভুল বুঝতে পারলে খুব সহজেই পূর্ববর্তী রায় থেকে ফিরে আসতেন। প্রকাশিত সত্যের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতেন।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আল-হাসান আল-আযরাকী রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর দরবারে বসা ছিলেন। তখন কুরাইশদের পরস্পর বিবদমান দু'টি দল নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়। উমর রা. উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন। তখন রায়টি যার বিপক্ষে গেল সে বললো, আমার একটি প্রমাণ আছে যা উপস্থিত করা হয়নি। উমর বললেন,

আমি যখন দেখছি সত্য তোমার প্রতিপক্ষের দিকে আছে, তখন সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব করতে পারিনি। তবে তুমি দ্রুত চলে যাও এবং তোমার প্রমাণ উপস্থিত

---

২৭. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আল-মুশতারী ইয়াজিদু বিমা ইশতারাহু আইবান ওয়া কদিস তাগাল্লাহু যামানান, হায়দারাবাদ, মাজলিসু দায়িরাতুল মাআরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., খ. ৫, পৃ. ৩২১; হাদীস নং-১১০৫৭

عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ قَالَ : ابْتَعْتُ غُلاَمًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لِى بِرَدِّهِ وَقَضَى عَلَىَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْنِى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِى مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَعَجِلْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا أَيْسَرَ عَلَىَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أُرِدْ فِيهِ إِلاَّ الْحَقَّ فَبَلَغَتْنِى فِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُنْفِذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِى أَنْ آخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِى قَضَى بِهِ عَلَىَّ لَهُ.

করো। যদি দেখি সত্য তোমার পক্ষে, তাহলে আমি হবো প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্ববর্তী রায়কে বাতিল করে নতুন রায় দিবে।[২৮]

তিনি আরো বলতেন,

একটি মাটির ঢেলা টুকরো টুকরো করে ফেলা অথবা একটি পত্র পাঠানোর পর তা আবার ফিরিয়ে আনার চেয়ে আমার একটি বিচারের রায় টুকরো টুকরো করে ফেলা আমার নিকট সহজ, যখন আমি দেখতে পাই যে, সত্য আমার প্রদত্ত রায়ের বিপক্ষে রয়েছে।[২৯]

৯. আমানতের খিয়ানত বা তা বিনষ্ট হলে শপথ নেওয়া। একবার ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ রহ. উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-কে জানান, তিনি বায়তুল মালের কিছু দীনার হারিয়ে ফেলেছেন। তখন উমর তাকে চিঠি লেখেন এভাবে,

فإني لست أقم دينك ولا أمانتك، ولكن أقم تضيعك وتفريطك، وإنما أنا حجيج المسلمين في مالهم، وإنما لأشحهم يمينك، فاحلف لهم والسلام

আমি তোমার দীনদারী ও আমানাতদারিতার ব্যাপারে অপবাদ দিচ্ছি না; বরং আমি সেটা বিনষ্টের ব্যাপারে অবহেলার কথা বলছি। আমি মুসলিমদের মালের ব্যাপারে শুধু ভাল চিন্তা করতে পারি। আমি তোমার কসম দ্বারা তাদের আশ্বস্ত করতে চাই। অতএব .তুমি তাদের জন্য হলফ কর। তোমার প্রতি সালাম।[৩০]

১০. 'কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন' যেমন তিনি বলেছেন মক্কাবাসীদের নিকট তাঁর প্রেরিত চিঠিতে।[৩১]

১১. কারো জন্য তার ন্যায়পরায়ণ ভাই-এর সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য হবে।[৩২]

১২. তিনি বিচারকদেরকে মানুষের সাথে বসতে, সর্বসাধারণের জন্য দরজা খোলা রাখতে এবং 'আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অধিকার লাভের পথ সহজসাধ্য করতে সব সময় নির্দেশ দিতেন। মদীনার কাযী ও আমীর আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি 'আম্‌র ইবনি হাযম রা. কে তিনি লিখলেন:

إياك والجلوس في بيتك، اخرج للناس، فآس بينهم في المجلس والمنظر، ولا يكن أحد من الناس آثر عندك من أحد

---

২৮. ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৭
২৯. ইবনুল জাওযী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৩০. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
৩১. প্রাগুক্ত। جاء كتاب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر
৩২. প্রাগুক্ত। أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلاً

আপনি আপনার বাড়ীতে বসে থাকা পরিহার করুন। মানুষের মধ্যে বের হোন এবং বৈঠকে, দেখা-সাক্ষাতে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন। কারো উপর কেউ যেন আপনার নিকট প্রাধান্য না পায়।[৩৩]

১৩. বিচার কাজে বিচারকদের বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগানো। একবার মিসরের বিচারক কাযী 'ইয়াদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ রহ. একটি বিষয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলে তিনি লিখেন,

إنه لم يبلغني في هذا شئ وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك

এ ব্যাপারে আমার নিকট পূর্ববর্তীদের থেকে কিছু পৌঁছেনি। বিষয়টি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ফয়সালা করুন।[৩৪]

ফিক্‌হি ইজতিহাদ

উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয রহ. ছিলেন একজন মহান তাবিঈ, ইমাম ও মুজতাহিদ। ইজতিহাদ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য মুজতাহিদের যে সকল শর্ত অত্যাবশ্যক, উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয রহ.-এর মধ্যে তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সেগুলো হলো, আরবী ভাষা ও পবিত্র কুরআনের জ্ঞান, সুন্নাতুর রাসূল স. সম্পর্কিত জ্ঞান, কিয়াস এবং সাহাবী ও তাবি'ঈগণের ইজতিহাদ সম্পর্কিত জ্ঞান, উছূলে ফিক্‌হের উপর গভীর জ্ঞান ও ইসলামী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান। এ ছাড়া তাঁকে হতে হবে উত্তম মেজাযের, আল্লাহভীরু, যিনি কখনও ইচ্ছাকৃত কবীরা গুনাহ করেননি ও ছগীরা গুনাহের কাজে পুনঃপুন লিপ্ত হন নি এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের বিপরীতে কোন কাজে জড়িয়ে পড়েননি। যে সকল বিধান সম্পর্কে ইজমা হয়েছে তার সার্বিক বিষয়ে অবগত হবেন। যাতে করে উম্মাত কর্তৃক ঐকমত্য পোষণকারী বিষয়ের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ তিনি না নেন।[৩৫] উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয রহ.-এর ইজতিহাদ থেকে অনেক ফিক্‌হি সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে সেখান থেকে নমুনাস্বরূপ কিছু সমাধান তুলে ধরা হলো :

রক্তপণ ও কিসাস

কিসাস হলো, অপরাধী কোন ব্যক্তির যেই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করবে তারও সে-ই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করা।[৩৬] রক্তপণ (দিয়াত) হলো খুন বা মানবদেহের

---

৩৩. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৩

৩৪. ইব্‌ন আব্দি রব্বিহি, *আল-ইকদ আল-ফারীদ*, খ. ২, পৃ. ২৫৪

৩৫. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, *ইলমু উছূলিল ফিকহ*, কায়রো : মাকতাবাতুত দাওয়াহ, শাবাবুল আযহার, ১৫শ সং, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ২১৮-২১৯

৩৬. আব্দুর রহমান আল-জাযিরী, *আল-ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, বৈরুত, খ. ৫, পৃ. ২৪৪

অপরাধের বদলায় অপরাধীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় সম্পদ।[৩৭] মানব হত্যা একটি মানবতা বিধ্বংসী জঘন্যতম অপরাধ। যখন কেউ তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে এ অপরাধ করে, তখন সে গোটা মানবতার সাথে শত্রুতা করে। একজন মানুষের জীবন বাঁচানো গোটা মানবজাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য।[৩৮] ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর মানব হত্যাই সবচাইতে বড় ও মারাত্মক অপরাধ। এ কারণেই ইসলামী শরী'আতে এ অপরাধের বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মানব-মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাতে চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলামী আইনে এর জন্য ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিসাস অথবা রক্তপণের বিধান দেয়া হয়েছে। উমর ইব্ন আব্দিল আযীয রহ. রক্তপণ ও কিসাসের ব্যাপারে বলেন :

১. কিসাস ও রক্তপণ গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে, সে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে;[৩৯]
২. হত্যাকারী ব্যক্তির ওয়ালী নাবালক হলে, বালেগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে;[৪০]
৩. হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ালীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যদি হত্যাকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়, তথাপি দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করতে হবে;[৪১]
৪. কখনো দিয়াত গ্রহণের পর বাদী-বিবাদীর মধ্যে সীমালঙ্ঘন বা ঝগড়া-ঝাটি হলে বিষয়টি ফয়সালার জন্য বাদশাহর নিকট যাবে।[৪২] দলীল হিসেবে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন-

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।[৪৩]

---

৩৭. উছমান যায়ল'ঈ, *তাব'ঈনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ১২৬; আলী আল-জুরযানী, *আত-তা'রীফাত*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি. খ. ১, পৃ. ১৪২

৩৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩২

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, তাহকীক : হাবিবুর রহমান আল-আজামী, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সং, ১৪০৩ হি. খ. ১০, পৃ. ১১

৪১. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩১৮

৪২. প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৬-১৭

৪৩. আল-কুরআন, ৪ : ৫৯

৫. হত্যাকারী ব্যক্তিকে পাওয়া না গেলে তখন বায়তুল মাল থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াত দিতে হবে। একবার বসরার বিচারক 'আদী ইব্‌ন আরতাত রহ. খলীফাকে জানালেন, নিহত ব্যক্তিকে বাজারে পাওয়া গিয়েছে। এখন কিভাবে তার রক্তপণ আদায় করবেন। উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয রহ. বায়তুল মাল থেকে তার রক্তপণ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[88]

৬. কেউ যদি ভিড়ে, গাদাগাদিতে, চাপে বা পদপিষ্ট হয়ে মারা যায় আর এমতাবস্থায় তার হত্যাকারীকে সনাক্ত না করা যায় তাহলে তার দিয়াত কি বিফলে যাবে? উমর ইব্‌ন আব্দিল আযীয রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

أن يوديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل

তার দিয়াত বায়তুল মাল থেকে দিতে হবে। কেননা কোন হাত অথবা পা তাকে হত্যা করেছে।[8৫]

দিয়াত বা রক্তপণের পরিমাণ

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. পূর্ণাঙ্গ দিয়াত বা রক্তপণের পরিমাণ একশত উট নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লিখেন,

أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير

রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় দিয়াতের পরিমাণ ছিল একশত উট।[8৬]

জিহবার দিয়াত : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. সৈন্যবাহিনীর নিকট লিখেন যে, তোমরা জিহবা কাটবে না। কেননা এতে সে পরিপূর্ণভাবে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তাই এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে এবং এর হিসাব থেকে এক চুলও কমানো যাবে না।[8৭]

কণ্ঠনালীর দিয়াত : কণ্ঠনালী শব্দের উৎপত্তি স্থল। কণ্ঠনালী কাটা গেলে কথা বলার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তাই এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দিয়াত দিতে হবে।[8৮]

পুরুষাঙ্গের দিয়াত : পুরুষাঙ্গ হলো একজন পুরুষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেটি চলে গেলে তার জৈবিক চাহিদা ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর মতে, যখন সম্পূর্ণ অঙ্গটি চলে যাবে তখন পূর্ণ দিয়াত দিতে

---

88. আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪৫৯
8৫. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
8৬. ইবন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি., ১৯৮৯ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ২৭০
8৭. আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৫৭
8৮. ইবন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১৭০

হবে। আর যখন এর ব্যতিক্রম হবে তখন ক্ষতির উপর ভিত্তি করে হিসাব করে দিয়াত দিতে হবে।[৪৯]

নারীর সতীত্বের দিয়াত : নারীর যোনীপথ প্রশস্ত বা নষ্ট করে দিলে সে সঙ্গমের স্বাদ হারিয়ে ফেলে। আর সেই সাথে নারী যদি প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয় এবং সন্তান ধারণে অপারগ হয়, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে মহিলাকে পরিপূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। আর যদি সঙ্গমে সক্ষম হয় এবং সন্তান ধারণ করতে পারে, তাহলে তিনভাগের একভাগ দিয়াত দিতে হবে।[৫০]

নাকের দিয়াত : নাক হলো শ্বাস-প্রশ্বাস ও সৌন্দর্যের স্থল। সে কারণে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. সম্পূর্ণ নাক ভেঙ্গে ফেললে অথবা কেটে ফেললে পরিপূর্ণ দিয়াতের কথা বলেছেন। এর কম হলে হিসাব অনুযায়ী হবে।[৫১]

কানের দিয়াত : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. কানের জন্য অর্ধেক দিয়াত নির্ধারণ করেছেন। কেননা সংবাদ শুনা ও শুনানো দু'টি কাজই কানের মাধ্যমে হয়।[৫২]

পায়ের দিয়াত : দু'টি পা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। এক পা ওয়ালা মানুষ বসে থাকা মানুষের মত। এজন্য এক পায়ের জন্য উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. অর্ধেক দিয়াত নির্ধারণ করেছেন।[৫৩]

দুই ভ্রুর পার্শ্বের দিয়াত : দুই ভ্রুর পার্শ্ব ভেঙ্গে গেলে চার ভাগের এক ভাগ দিয়াত দিতে হবে।[৫৪]

কপালের দিয়াত : কপাল ভেঙ্গে ফেললে তার দিয়াত হলো ১৫০ দীনার।[৫৫]

থুতনির দিয়াত : থুতনি ভেঙ্গে ফেললে তিনভাগের একভাগ দিয়াত।[৫৬]

হাত বা পায়ের আঙ্গুলের দিয়াত : প্রত্যেক হাত বা পায়ের আঙ্গুলের দিয়াত হলো দশ ভাগের এক ভাগ বা ১০টি উট। আর আঙ্গুল টুকরো টুকরো করলে তিনভাগের এক ভাগ দিয়াত।[৫৭]

---

৪৯. আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৭২
৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৭৭
৫১. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৫৩. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২০৯
৫৪. আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩২০
৫৫. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৯১
৫৬. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

নখের দিয়াত : নখ কালো করে ফেললে অথবা পড়ে গেলে আঙ্গুলের দিয়াতের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়াত। অর্থাৎ দশ দীনার দিয়াত প্রত্যেক নখের জন্য।[৫৮]

হদ্দ সম্পর্কিত বিষয়

হদ্দের গুরুত্ব : ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় হদ্দ হলো কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।[৫৯] এ ধরনের শাস্তিসমূহে বান্দার অধিকারের চাইতে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের দিকটি প্রবল ধরা হয়।[৬০] কেননা হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধগুলোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। শরী'আতের হদ্দগুলো হলো : চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ ও মদপানের শাস্তি। তবে কোন কোন ফকীহ্ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিকেও হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. হদ্দ বাস্তবায়নের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলতেন, আমার নিকট হদ্দের গুরুত্ব নামায ও যাকাত আদায়ের মত।[৬১] কেননা তার মাধ্যমে মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ইমাম অথবা বিচারকের নিকট হদ্দ পৌছনোর পর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বরং তা কার্যকরী করা অপরিহার্য হয়ে যায়।[৬২]

---

৫৮. প্রাগুক্ত

৫৯. হানাফীগণের মতে হদ্দ হল- عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا وجبت حَقًّا لله تَعَالَى "আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রবর্তিত শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তি।" দ্র. আবু বকর মুহাম্মদ সারাখ্‌সী, *আল-মাবসূত*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফা, খ. ৯, পৃ. ৩৬। তবে শাফি'ঈ ইমামগণের মতে হদ্দ হল- عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تَجِبُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ حَقًّا لله أَوْ لِآدَمِيٍّ أَوْ لَهُمَا "আল্লাহ কিংবা কোন মানুষের অধিকার অথবা একসাথে আল্লাহ ও মানুষের অধিকার বিঘ্নিত হয়, সে সব অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়।" দ্র. আল-জুমাল, *ফুতুহাতুল ওয়াহহাব*, বৈরুত : দারুল ফিকর, খ. ৫, পৃ. ১৩৬। এরূপ শাস্তিকে এজন্য হদ্দ বলা হয় যে, তা পুনরায় অপরাধ করা এবং অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়া থেকে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে তা অপরকে অপরাধের পথে চলা থেকে বারণ করে।

৬০. এ কারণেই কিসাসকে হদ্দ বলা হয় না। কেননা এতে আল্লাহর অধিকারের চাইতে বান্দার অধিকার বাস্তবায়নের দিক প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে তা'যীরকেও হদ্দ বলা হয় না। কেননা এটা সুনির্ধারিত নয়। আবার কারো কারো মতে, কিসাসও হদ্দের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শরী'আতের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহই হল হুদূদ। চাই তা আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য ফরয করা হোক কিংবা বান্দার হক প্রতিষ্ঠার জন্য করা হোক। দ্র. *আল-মাবসূত*, খ. ৯, পৃ. ৩৬

৬১. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮

৬২. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে সে ক্ষেত্রে তিনি হদ্দ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন,

> প্রত্যেক সন্দেহের ক্ষেত্রে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী হদ্দ কায়েম থেকে বিরত থাক। কারণ একজন ওয়ালী বা শাসকের জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করার চেয়ে ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করাই শ্রেয়।[৬৩]

তাঁর দৃষ্টিতে হদ্দ প্রতিষ্ঠা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, নিজ হাতেও মাঝে মাঝে তা বাস্তবায়ন করেছেন। উবাদা ইব্‌ন নুসাঈ রহ. বর্ণনা করেন,

> شهدت عمر بن العبد العزيز يضرب رجلا حدا في خمر، فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين، رأيت منها ما بضع ومنها لم يبضع ثم قال : إنك إن عدت الثانية ضربتك، ثم ألزمتك الحبس حتى تحدث خيرا- قال يا أمير المؤمنين، أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبدا قال فتركه عمر

> আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-কে মদ পানের শাস্তি হিসেবে এক ব্যক্তিকে মারতে দেখেছি। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের কাপড় খুলে ফেলেন। তারপর আশিটি বেত্রাঘাত করেন। আমি তার দেহের কিছু ত্বক আহত ও কিছু অক্ষত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি লোকটির উদ্দেশ্যে বলেন : যদি দ্বিতীয়বার পান করো তাহলে আবার পেটাবো। তারপর কারাগারে আটকে রাখবো- যতদিন না ভালো হবে। সে বললো : হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি যেন আর কখনো এ কাজ না করি। অতঃপর তিনি তাকে ছেড়ে দেন।[৬৪]

এক ব্যক্তি একাধিক হদ্দের অধিকারী হলে করণীয় : এক ব্যক্তি যখন একাধিক অপরাধের কারণে যেমন-ব্যভিচার, চুরি ও খুন করে, তখন একটার পর একটা হদ্দ কার্যকরী করতে হবে। অর্থাৎ ব্যভিচার ও চুরির শাস্তি দেওয়ার পর তাকে হত্যা করতে হবে।[৬৫] ফাঁসি অথবা কতল বা শূলে ততক্ষণ চড়ানো যাবে না, যতক্ষণ খলীফা একমত না হবেন বা সম্মতি না দিবেন।[৬৬]

হদ্দের পাথর বা বেত্রাঘাত যার উপর প্রয়োগ হবে তাকে মুসলিম হতে হবে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর মতে কোন কাফিরের উপর এটা কার্যকর হবে না। কেননা কুফরী ব্যভিচারের অপবাদের চেয়ে বড় গুনাহ। তারিক ইব্‌ন আব্দির রহমান এবং মুতাররিফ ইব্‌ন তারিফ দু'জন হতে বর্ণিত, তারা বলেন, শা'বী রা.-এর নিকট থাকা অবস্থায় দু'জন লোক, যাদের একজন মুসলিম আরেকজন খ্রিস্টান এসে

---

৬৩. ইব্‌নুল জাওযী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৬৪. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

৬৬. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, মিসর : আল-মাতবা'আতুর রহমানিয়্যা, ১৯২৭, পৃ. ১১৪-১১৫

একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করলো। অতঃপর খ্রিস্টান মুসলিমকে আশিটি বেত্রাঘাত করলো আর খ্রিস্টানকে ছেড়ে দিয়ে বলা হলো, তার কুফরীটা অপবাদের চেয়ে বড় গুনাহ। বিষয়টি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর নিকট আসলে তিনি শা'বী রা.-এর মত সমর্থন করেন।[৬৭]

পিতা ছেলেকে অপবাদ দিলে হদ্দ কার্যকর হবে কিনা? পিতা ছেলেকে অপবাদ দিলে তাহলে পিতাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি সন্তান পিতাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর হবে না।[৬৮]

স্ত্রী নিজেই স্বামীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে : একবার এক মহিলা এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, তার স্বামী তাকে খারাপ কাজ করানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি বললেন, কেউ কি বিষয়টি শুনেছে বা দেখেছে? মহিলা বললেন, না। অতঃপর উমর রহ. লোকটিকে বেত্রাঘাত করলেন। কেননা ব্যভিচার সংঘটিত হয়নি, বরং মুখে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[৬৯]

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. বলেন, চোর চুরি করে ঘর থেকে বের না হয়ে গেলে হাত কাটা যাবে না। বরং হাত কাটার শর্ত হলো চুরি করে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া।[৭০] কবর খুঁড়ে কেউ যদি মৃত ব্যক্তির কাফন চুরি করে তারও হাত কাটতে হবে।[৭১]

দ্বিতীয়বার মদপানের শাস্তি : উবাদাহ ইবনু নুসাই রহ. বলেন, আমি একদিন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর নিকট ছিলাম, তিনি তখন এক ব্যক্তিকে মদপানের জন্য শাস্তি দিচ্ছিলেন। শাস্তি দেওয়ার পর তিনি তাকে আরো বলেন, যদি তুমি আবার মদপান করো তাহলে আমি তোমাকে পিটিয়ে জেলখানায় বন্দী রাখবো। এরপর লোকটি তাওবা করলো এবং খলীফা তাকে ছেড়ে দিলেন।[৭২]

মদ পরিবেশনকারীর শাস্তি : মদপান করা এবং পান করার জন্য সহযোগিতা করা, যেমন: তৈরী করা, পৌঁছে দেওয়া ব্যক্তিও পানকারীর চেয়ে কম অপরাধী নয়। ইবনুত তামীমী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

> একদা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. একদল লোককে মদপান অবস্থায় পেলেন। অতঃপর তাদের মদ পরিবেশনকারীকেও তাদের সাথে পেলেন, এ অবস্থায় মদ পরিবেশনকারীকে তাদের সাথে শাস্তি দিলেন।[৭৩]

---

৬৭. আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৩০-১৩১

৬৮. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫০৪

৬৯. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৭০. প্রাগুক্ত

৭১. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০. পৃ. ৩৪

৭২. ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫

৭৩. আব্দুর রাজ্জাক, *আল-মুছান্নাফ*, খ. ৯, পৃ. ২৩০

মদ নষ্ট করার সাথে পানপাত্র ও সংরক্ষণের পাত্রও ভেঙ্গে দেওয়া : হারুন ইব্‌ন মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে দেখলাম তিনি খুনাসিরাতে যেয়ে মদের থলি ফাটিয়ে ফেলার এবং কাঁচের পাত্র ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন।[৭৪]

মুসলমানের দেশে অমুসলিমের মদ ঢুকানোর বিধান : কোন কাফিরের নিজ দেশে মদ খাওয়ার অনুমতি থাকলেও মুসলিমের দেশে এগুলো নিয়ে আসতে পারবে না।[৭৫]

যাদুকরের শাস্তি : পত্রের মাধ্যমে এক যাদুকর মহিলার ব্যাপারে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তরে লিখেন, "যদি তাকে চেনা যায় এবং প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।"[৭৬] আর এটাই আবু হানীফা, মালিক ও আহমাদ রহ. প্রমুখ ইমামগণের অভিমত। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাব রা. তাঁর খিলাফতকালে লেখেন যে, "তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করবে।"[৭৭]

মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবার সুযোগ দান : রাবী'আ ইব্‌ন আতা রহ. উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুরতাদ ব্যক্তিকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় তার শিরচ্ছেদ করতে হবে।[৭৮]

মুরতাদের তাওবার পদ্ধতি : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর নিকট বলা হলো এক ইহুদী মুসলিম হওয়ার পর আবার মুরতাদ হয়ে গেছে। উমর রহ. বললেন, তাকে প্রথমে ইসলামের দিকে আহবান করো, যদি ফিরে আসে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। যদি অস্বীকার করে তাহলে কাঠের সাথে শায়িত করে বেঁধে রাখ এবং আবারও ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাবে। যদি তারপরও অস্বীকার করে তাহলে বোঝা চাপিয়ে দাও, এরপর বর্শার ফলা তার বুকে ধরে ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাবে। যদি সে ফিরে আসে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় তাকে হত্যা করো।[৭৯]

উল্লেখ্য, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. ছাড়া কেউ এরূপ মত দেননি। বরং চার ইমামের সকলেই তাওবা করার আহবানের পর ফিরে না আসলে হত্যার ব্যাপারে মত

---

৭৪. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫
৭৫. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
৭৬. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০. পৃ.১৩৫
৭৭. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
৭৮. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫
৭৯. ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২. পৃ. ২৭৪

দিয়েছেন। 'তিনি মুরতাদ মহিলাদেরকে তাওবার দিকে আহ্বান জানানোর পর ফিরে না আসলে তাদেরকে দাসীতে পরিণত করার এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার কথা বলেছেন, যদিও অনেকে তাদেরকে হত্যা করার কথা বলেছেন।'[৮০]

তা'যীর

আল্লাহ তাআলা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য কোন শাস্তি কিংবা কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করে দেননি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে।[৮১] ইসলাম যে সকল অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে তো কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। তবে ইসলাম তা'যীর বা নিবর্তনমূলক শাস্তির কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। বরং বিষয়টি শাসন-কর্তৃত্ব তথা সমকালীন ইমামের উপর ছেড়ে দিয়েছে। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর সময়ে তা রীতিমত যুলমে পরিণত হয়। কোন কোন শাসক এত কঠোরতা করতো যে, মামুলী ধরনের অপরাধ, এমনকি শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তিনশো চাবুক পর্যন্ত মারতো।[৮২] কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে খলীফা ওয়ালীদ মানুষকে গ্রেফতার করতেন এবং তাদেরকে হত্যার মত কঠোর শাস্তি দিতেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. এ সকল অন্যায় ও নিপীড়ন পদ্ধতি ও কর্মপন্থার দিকে দৃষ্টি দেন এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ড দূর করেন। এজন্য তিনি তা'যীরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা নির্ধারণ করে দেন :

১. ধারণাপ্রসূত কোন অপবাদে অথবা সন্দেহের ভিত্তিতে পাকড়াও করে শাস্তি না দেওয়ার ব্যাপারে তিনি জোর তাকিদ দিয়েছেন। শরী'আহ্ প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ ছাড়া প্রতিটি মুসলমানের পিঠ সম্পূর্ণ নিরাপদ। মূসিলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামির ঘটনা অত্যধিক বেড়ে যায়। তথাকার শাসক এ অপরাধ দমনের জন্য সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে শাস্তি দিবেন কিনা জানতে চান? জবাবে তিনি লেখেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ অনুযায়ী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করবে। সত্য এবং সঠিক পন্থাই যদি তাদেরকে সংশোধন করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন না করুন![৮৩]

২. তিনি শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়।

---

৮০. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب المرتدة، فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل دينها

৮১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শূয়ুন আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ১২, পৃ. ২৫৪

৮২. প্রাগুক্ত

৮৩. ইবনুল জাওযী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

এক. সর্বোচ্চ পরিমাণ তিরিশ বেত্রাঘাত অবস্থাভেদে স্বাধীন ও দাস নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৮৪]

দুই. তা'যীরের পরিমাণ হদ্দের কম হতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ ৩৯ বেত্রাঘাত[৮৫] এবং দাস-দাসীর জন্য ১৯ বেত্রাঘাতের বেশী হবে না।[৮৬] তিনি তা'যীরের সর্বনিম্ন শাস্তিকে এক বেত্রাঘাত হতে পারে বলেও মত দিয়েছেন।[৮৭]

উল্লেখ্য, ব্যভিচারের অপবাদদানকারী দাস-দাসীর ক্ষেত্রে হদ্দের পরিমাণ ৪০ বেত্রাঘাত।

৩. তা'যীরের শাস্তি হিসেবে মাথার চুল অথবা দাড়ি মুণ্ডিয়ে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর এক ওয়ালীকে পত্র লেখেন।[৮৮] উমাইয়্যা খিলাফতকালে কিছু সংখ্যক লোক একাজটিকে শাস্তি হিসেবে চালু করে। উল্লেখ্য, চার ইমামের সকলেই দাড়ি মুণ্ডিয়ে শাস্তি দেয়াকে অবৈধ বলে মত দিয়েছেন। উপরন্তু, ইমাম আবু হানীফা ও মালিক রহ. প্রমুখ মাথা মুণ্ডিয়ে শাস্তি দেওয়াকেও অবৈধ বলেছেন।[৮৯]

যুদ্ধের বিধি-বিধান

যুদ্ধের বিধি-বিধান সম্পর্কিত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর মতসমূহ ।

১. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কমপক্ষে পনের বছর বয়স হওয়া শর্ত আরোপ করেন।[৯০]

২. অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর কথা বলেন। যদি তারা তা গ্রহণ না করে, তবে তাদেরকে জিযইয়া প্রদানের জন্য আহ্বান জানানোর কথা বলেন।

---

৮৪. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, মিসর : আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়্যা, ১৩৪৬ হি., পৃ. ১৫০; ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৪

৮৫. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফি'ঈ ও অধিকাংশ হাম্বলী ইমাম এ ব্যাপারে একমত। কেননা রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ "যে অপরাধে হদ্দ নেই, তাতে যে ব্যক্তি হদ্দ পরিমাণ শাস্তি দেবে, সে সীমালঙ্ঘনকারী হবে।" দ্র. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : আল-আশরিবাতি ওয়াল হাদ্দি ফীহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিত তাযীর ওয়া আন্নাহু লা ইউবলাগু আরবাঈন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৯; হাদীস নং-১৮০৪০

৮৬. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, পৃ. ৩০২

৮৭. প্রাগুক্ত। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী কর্মকর্তাদের নিকট নিম্নোক্ত চিঠিটি প্রেরণ করেন
أن عاقبوا الناس على قدر ذنوهم، وإن بلغ ذلك سوطا واحدا وإياكم أن تبلغوا بأحد حدا من حدود الله

৮৮. ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৮৬

৮৯. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, পৃ. ৩০৩

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৩. যারা যুদ্ধের সময় প্রহরীর দায়িত্ব পালন করবেন তাদের জন্য ৪০ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন।[৯১]

৪. অমুসলিমদের নিকট যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।[৯২]

৫. মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দেন। পুরুষ, নারী, দাস, যিম্মী সকলকে মুক্ত করার ব্যাপারে নির্দেশ দেন।[৯৩]

বিয়ে ও তালাক

বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ওলী বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে অবৈধ।

২. যার কোন ওলী পাওয়া যাবে না তার ওলায়াতের বা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করবেন সে দেশের সুলতান বা বাদশাহ।[৯৪]

৩. কোন মহিলাকে দু'জন ওলী দু'ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলে এ অবস্থায় মহিলাটি তাঁর বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করে যাকে ইচ্ছা স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারবে।[৯৫]

৪. কোন মহিলার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পর সেই ব্যক্তিকে বিয়ে করলে তিনি এ বিয়েকে মন্দের ভালো বলে মনে করতেন।[৯৬]

৫. কারারুদ্ধ ব্যক্তি যতদিন কারাগারে থাকবে ততদিন তার স্ত্রীকে বিয়ে করা যাবে না ।[৯৭]

৬. নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন শেষে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে।[৯৮]

৭. কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে; কিন্তু সে তার কোনো মীরাছ পাবে না এবং তাকে কোনো 'ইদ্দাতও পালন করতে হবে না।[৯৯]

৮. মহর শুধু মেয়ের জন্যই, এক্ষেত্রে পিতা বা অন্য কেউ দাবী করলেও সেখান থেকে কিছু পাবে না। এমনকি মহরের সাথে পিতা আলাদাভাবে কোন অর্থ বা সম্পদ

---

৯১. ইব্ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫
৯২. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্ন আবদুল আযীয*, পৃ. ৩০৬
৯৩. ইব্ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪
৯৪. ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩২
৯৫. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
৯৬. ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫০
৯৭. ইব্ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫১। لا تنكح امرأة الأسير أبداً ما دام أسيرا
৯৮. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
৯৯. ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩১-৩৩২

বিয়ের সময় স্বামীর নিকট শর্ত আরোপ করলেও, তাহলে সেটার মালিকানাও মেয়েরই থাকবে, পিতা সেখান থেকে কিছুই পাবে না।[১০০]

৯. কৌতুক করে তালাক দিলেও সেটা তালাক হিসেবে পতিত হবে।[১০১]

১০. জোরজবরদস্তিকৃত ব্যক্তির তালাক পড়বে না।[১০২]

১১. অর্ধেক তালাক বলে কোন কিছু শরী'আতে নেই। বরং তা পূর্ণাঙ্গ তালাক হবে।[১০৩]

১২. যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয় এবং এ অবস্থায় স্ত্রী নিজেকে তিন তালাক প্রদান করে, তা এক তালাক রূপে গণ্য হবে।[১০৪]

১৩. কাফিরের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।[১০৫]

১৪. যে ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে দু'বৎসর ধরে অনুপস্থিত, সে হয়তো তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে অথবা সে তার কাছে ফিরে আসবে।[১০৬]

যাকাতের বিধি-বিধান

মধুর যাকাত : ইমাম বুখারী রহ. বলেন : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. মধুতে যাকাত আছে বলে মনে করেননি।[১০৭] ইমাম মালিক রহ. তাঁর "আল-মুয়াত্তা" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন হাযম রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার পিতার নিকট উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর একটি চিঠি আসে। তখন তিনি মিনায় ছিলেন। তাতে লেখা ছিল, ঘোড়া ও মধুতে যাকাত নেই।[১০৮]

ছোলা, মটর কলাই, মসুরি, শিমজাতীয় শস্যের বীচি ইত্যাদির যাকাত : ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ রহ. বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. লেখেন যে, ছোলা ও মসুরির যাকাত গ্রহণ করা হোক। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী মালিক তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর খাতায় লেখা ছিল : শিম জাতীয় শস্যের বীচির যাকাত গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে গম-যব থেকে গ্রহণ করা হয়।[১০৯]

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
১০১. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৬
১০২. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯
১০৩. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৩
১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৭
أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
১০৫. সাল্লাবী, *সীরাতু উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯। من غاب عن إمراته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها.
১০৭. ইবন হাজার আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮
১০৮. ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : যাকাতুর রাকীক ওয়াল খায়ল..., হা.নং-৩৩৬
১০৯. আব্দুস সাত্তার আশ-শায়খ, *উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. খামিসু খুলাফা আর রাসূল*, দিমাশক : দারুল কালাম, তা. বি. পৃ. ৯০

মহিষের যাকাত : ইব্‌ন শিহাব রহ. বলেন : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. লেখেন : গরুর যাকাত যেভাবে গ্রহণ করা হয় মহিষের যাকাতও সেভাবে গ্রহণ করতে হবে।[১১০]

'তিলা' পানের বিধান

'তিলা' (الطلاء) হলো আঙ্গুর ছাড়া অন্য কোন কিছু ভিজানো পানি, যা পান করলে নেশার উদ্রেক করে। ইব্‌ন আওন রহ. বলেন : ইব্‌ন সীরীন রহ.-কে যখন তিলা পানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন :

> সত্য-সঠিক পথের অনুসারী ইমাম অর্থাৎ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. তা পান করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে উমারের যুক্তি হলো, এই তিলার মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তিলা নামে যা বুঝানো হয় তা আসলে মদ। এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা বহু হালাল পানীয় আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং নেশাদায়ক পানীয়কে হারাম বিশ্বাস করে তা পান থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের উচিত। কারণ, মদ সকল পাপের সদর দরজা। এই তিলা পান করতে করতে এক সময় মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে মাদকদ্রব্য পানে আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়।[১১১]

নামাযে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার বিধান

আবদুল হাকীম ইবন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী ফারওয়া রহ. বলেন : উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয মদীনায় আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। তিনি জোরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।[১১২]

সাহু সিজদার বিধান

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাজির রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি সাহু সিজদার ব্যাপারে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-কে লক্ষ্য করে ইমাম যুহরী রহ.-কে বলতে শোনেন যে, এটা সালামের পূর্বে। কিন্তু উমর রহ. তা মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, ওহে শিহাব! এ ব্যাপারে আবু সালামা ইব্‌ন আব্দির রহমান আমাদেরকে অবহিত করেছেন। মতান্তরে তিনি যুহরী রহ.-কে বলেন, আমাদের সামনে আবু সালামা ইব্‌ন আব্দির রহমান ইব্‌ন আওফ একথা মানতে অস্বীকার করেছেন।[১১৩]

মৃত জন্তুর হাড়ের বিধান

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ.-এর এক দাসী বলেন : একবার উমর আমাকে তেল আনতে বললেন। আমি তেল ও হাতির হাড়ের একটি চিরুনি নিয়ে আসলাম। তিনি চিরুনিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা মৃত জন্তুর অংশ। আমি বললাম, এটা মৃত হলো কিভাবে? বললেন : তোমার জন্য আফসোস! হাতিটি কে জবাই করেছিল?[১১৪]

---

১১০. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩
১১১. ইব্‌নুল জাওযী, *সীরাতে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১১২. ইব্‌ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৩৫
১১৩. সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২২৫।
১১৪. ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০১

উল্লেখ্য যে, এটা একটা মতবিরোধমূলক মাসয়ালা। ইমাম যুহরী রহ. হাতি বা এ জাতীয় মৃত জন্তু জানোয়ারের হাড় সম্পর্কে বলেন : আমি পূর্ববর্তী বহু 'আলিমকে পেয়েছি যাঁরা এ রকমের হাড়ের তৈরী চিরুনি দ্বারা চুল আঁচড়িয়েছেন এবং এ রকমের হাড়ের পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করেছেন। কোন রকম দোষ মনে করেননি।[১১৫]

অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার বিধান

উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. এ কাজ বৈধ মনে করতেন। বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে মাঝে মাঝে এ কাজ করেছেন। এ লক্ষ্যে একবার এক বিশপকে এক লক্ষ দীনার দান করেন।[১১৬]

যিম্মীর জিযিয়ার বিধান

যিম্মীর জিযিয়া গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে। আমর ইব্‌ন আল-মুহাজির রহ. উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বে যদি কোন যিম্মী মুসলিম হয়, তাহলে তার থেকে জিযিয়া নেওয়া যাবে না।

সুওয়াইদ ইব্‌ন হুসাইন রহ. বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রহ. লেখেন : "জিযিয়া যদি পাল্লার এক প্রান্তে থাকে, আর তখন যিম্মী মুসলিম হয়ে যায়, তাহলেও তার নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না।"[১১৭]

কারা আইন

রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপরাধীর অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা জরুরী। তবে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে শাস্তির ধরন এবং অপরাধের অবস্থার ভিন্নতা হয়ে থাকে। ইসলাম যেহেতু একটি সুসভ্য ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, এ কারণে কারাবন্দীদের সাথে এর বিধি-বিধান ও আচরণে মানবিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সূচনা হয়েছিল আলী রা.-এর খিলাফতকাল থেকে। বায়তুল মাল থেকে তিনি কারাবন্দীদের পোশাক ও খাবার সরবরাহের নির্দেশ দেন। কারারুদ্ধ ব্যক্তি বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থ থেকে অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হতো। অন্যথায় বায়তুল মাল থেকে তার জন্য খরচ করা হতো।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন,

> কোন গোত্রে অথবা সম্প্রদায়ে কোন অপরাধী থাকলে আলী রা. তাকে কারারুদ্ধ করতেন। তারপর সে বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা

---

১১৫. সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪

১১৬. ইব্‌ন সাদ, *আত-তবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০

১১৭. প্রাগুক্ত

করতেন। আর বিত্তহীন হলে বায়তুল মালের অর্থ থেকে তার জন্য খরচ করা হতো।[১১৮]

তিনি বলতেন, 'তাদের মন্দ লোককে বন্দী করা হবে এবং তাদের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে।' পরবর্তী খলীফাগণ যদিও এ নিয়ম চালু রাখেন, তবে উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর সময়কাল পর্যন্ত এই নিয়মে নানারকম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা ঢুকে পড়ে। যেমন : যে সকল কয়েদী নিজের জন্মস্থান ও আত্মীয়-বন্ধুদের থেকে বহু দূরে কারাগারে মারা যেত, তাদের লাশ দুই দিন পর্যন্ত কারাগারে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকতো। অবশেষে কারাগারের কয়েদীরা নিজেদের দান-সদাকা সংগ্রহ করে শ্রমিকদের মাধ্যমে লাশটি কবরস্তান পর্যন্ত পৌছে দিত।[১১৯]

উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ. কারাগারের এ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কুঠুরীর পরিবর্তে প্রশস্ত, উন্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন কক্ষ নির্মাণ করান ও নিম্নোক্ত কারা আইনসমূহ প্রবর্তন করেন :

১. মৃত কয়েদীদেরকে কাফন-দাফন ছাড়াই ফেলে রাখার যে বিধান চালু হয়েছিল তা যে কত বড় অপরাধ সে সম্পর্কে চিঠি লিখে আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের সতর্ক করেন।

২. সাধারণভাবে তিনি এ নির্দেশ দেন যে, নামায আদায় করতে অসুবিধা হয়, কোন কয়েদীকে এমন ভারি বেড়ী পরানো যাবে না এবং কেবল মানুষ হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকল কয়েদীদের বেড়ী রাতে খুলে দিতে হবে।

৩. কয়েদীদের যে সব খাদ্য দেওয়া হতো সে ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসততার অভিযোগ শোনা যেত। তাই তিনি খাদ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য নির্ধারিত অর্থ মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের নির্দেশ দেন।[১২০]

৪. বিভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কয়েদীদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ জারী করেন।

৫. অসুস্থ কয়েদীদের যদি আপনজন না থাকে অথবা তার নিকট অর্থ না থাকে তাহলে তাকে দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করার নির্দেশ দেন।

৬. ঋণ পরিশোধে অপারগতার কারণে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে অন্য ধরনের অপরাধীদের সাথে একই সেলে না রাখার কথা বলেন।

---

১১৮. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال انفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال انفق عليه من بيت مال المسلين وقال : يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم–

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১২০. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৭. মহিলাদেরকে পৃথকভাবে রাখার নির্দেশ দেন।

৮. জেলারদেরকে নির্দেশ দেন সৎ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ দিতে, যাতে সে ঘুষ না খায়।

৯. প্রাদেশিক গভর্নরগণকে সপ্তাহে একদিন ব্যক্তিগতভাবে কারাগার পরিদর্শন করে কয়েদীদের অবস্থা পর্যালোচনা এবং তাদের অভিযোগ শোনার ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[১২১]

১০. কয়েদীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

১১. প্রত্যেক কয়েদীকে তার প্রয়োজনানুরূপ ভাতা দেওয়ার কথা বলেন।

১২. কয়েদীকে নিজের ভাতা নিজে গ্রহণ এবং নিজের খাবার নিজে তৈরী করার সুবিধা দিতে বলেন।

১৩. প্রত্যেক কয়েদীকে শীত ও গরমের কাপড় প্রদান করার নির্দেশ দেন এবং মহিলা কয়েদীদের প্রয়োজনীয় কাপড় ছাড়াও একটি অতিরিক্ত চাদর দেওয়ার কথা বলেন।[১২২]

তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে কারাগারগুলো নৈতিক ও আদর্শিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অধিকাংশ কয়েদী উত্তম নাগরিক হয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসতো।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, বিচার ব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর যে অসামান্য অবদান রয়েছে, তার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। আধুনিক বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যুল্ম, নির্যাতন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যভিচার, অবৈধ সম্পদ দখল, মদপান, বিভিন্ন নামে মদজাতীয় পানীয় বিক্রি, নারী নির্যাতন, তালাক ও বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আত লঙ্ঘন ইত্যাদি কার্যক্রমের বিস্তারে দিন দিন অন্যায়-অবিচারে ভরে যাচ্ছে। তাই এ সমাজ ও রাষ্ট্রকে নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্হী ইজতিহাদ আমাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে যারা মনে করেন, আধুনিক বিচার ব্যবস্থা ইসলামের আলোকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য তাঁর গৃহীত বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্হী ইজতিহাদ নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করবে সন্দেহ নেই।

---

[১২১] ইব্ন সাদ, *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৬৩, ২৮৮

[১২২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ : শরয়ী বিধান

মুহাম্মদ রবিউল আলম*

[**সারসংক্ষেপ :** *আদম ও হাওয়া আ. থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে দু'টি ইবাদত আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং আখিরাতে জান্নাতেও যা বিদ্যমান থাকবে, তন্মধ্যে একটি হলো ঈমান আর অপরটি হলো বিবাহ।*[১] *ইসলামী শরীয়তে বিবাহ হলো এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনার নাম, যা দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে দেয়, যার মাধ্যমে তারা সমাজে বৈধভাবে সংসার করতে পারে। বিবাহ বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে বিবাহের কিছু নিয়ম-কানুন, যা না হলে বিবাহ বৈধ হয় না। অনুরূপভাবে ইসলামী শরীয়তেও বিবাহের কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা না হলে বিবাহ বৈধ হবে না। যেমন একজন মুসলিম নারী কোন মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু কোন অমুসলিমকে বিবাহ করতে পারে না; অথচ বর্তমানে অনেকে এ ধরনের অবৈধ বিয়েকে বৈধতা দেয়ার জন্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ বৈধ কি-না, তা পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি।*]

বিবাহের পরিচয়

বিবাহকে আরবীতে বলা হয় 'নিকাহ্'। এর আভিধানিক অর্থ মিলানো (الضم) ও একত্র করা (الجمع) ইত্যাদি।[২] বিবাহ অর্থে এ শব্দ পবিত্র কুরআনেও এসেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

'তোমরা তোমাদের পছন্দমত নারী বিবাহ করো'।[৩]

এ শব্দটি সহবাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

'আর যদি সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে ঐ স্ত্রী তার (স্বামী) জন্যে বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে (বিবাহ করে) সহবাস না করে।'[৪]

---

* প্রভাষক, আরবী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১. ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ির*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪০০ হি., পৃ. ১৭৭, ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি., খ. ৩, পৃ. ৩।

২. 'আলী জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, বৈরূত : দারুল কিতাবীল 'আরবী, ১৪০৫ হি.,পৃ. ৩১৫

৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩

৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিবাহ এমন একটি চুক্তিকে বলা হয়, যা এমন দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পাদিত হয়, যাদের পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে শরীয়ত বাধা প্রদান করে না এবং এর ফলে তাদের একজন অপরজনকে স্বামী-স্ত্রী সুলভ ভোগ করা বৈধ হয়।[৫]

বিবাহের রুকন

হানাফী মাযহাব মতে, বিবাহের রুকন (মূল উপাদান) দু'টি। একটি হলো 'ইজাব' বা প্রস্তাব দেয়া আর অপরটি হলো 'কবুল' বা প্রস্তাব গ্রহণ করা। এ দু'টি ছাড়া বিবাহ সম্পাদিত হবে না।[৬]

বিবাহের শর্তাবলী

বিবাহের শর্তাবলী তিন প্রকার : প্রথম প্রকার ইজাব-কবুল সম্পর্কিত, দ্বিতীয় প্রকার পাণিগ্রহণেচ্ছু নারী-পুরুষ সম্পর্কিত ও তৃতীয় প্রকার বিবাহের সাক্ষী সম্পর্কিত।

প্রথম প্রকার ইজাব-কবুল সম্পর্কিত শর্তাবলী

বিবাহ শুদ্ধ হবার জন্যে ইজাব-কবুল শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর ইজাব-কবুল শুদ্ধ হবার জন্যে পাঁচটি বিষয় পাওয়া যেতে হবে। যথা-

১. বিবাহ বোঝা যায় এমন সুনির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা ইজাব-কবুল হওয়া, যেমন- 'আমি তোমাকে বিবাহ করেছি' ইত্যাদি;
২. ইজাব-কবুল একই মজলিসে হওয়া;
৩. কবুল বা প্রস্তাব গ্রহণটি ইজাবের বিপরীত না হওয়া; যেমন- কেউ বলল, 'আমি এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম', এর প্রত্যুত্তরে স্বামী বলল, 'আমি বিবাহ কবুল করেছি; কিন্তু এক হাজার টাকার মাহর মেনে নিচ্ছি না।' তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।
৪. ইজাব-কবুলের শব্দ স্বামী-স্ত্রী কিংবা তাদের উকিল পরস্পর শোনা;
৫. ইজাব-কবুলের শব্দদ্বয় কোন নির্দিষ্ট সময় জ্ঞাপক না হওয়া; যেমন- 'আমি তোমাকে বিবাহ করেছি এক বছরের জন্যে' কিংবা আমি কবুল করেছি এক বছরের জন্যে' ইত্যাদি।[৭]

দ্বিতীয় প্রকার পাণিগ্রহণেচ্ছু নারী-পুরুষ সম্পর্কিত শর্তাবলী

পাণিগ্রহণেচ্ছু নারী-পুরুষ সম্পর্কিত শর্তগুলো হলো-

---

৫. আলাউদ্দিন হাসকাফী, *আদ্-দুর্‌রুল মুখতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি., খ. ৩, পৃ. ৩-৪

৬. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, *আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি, খ. ৪, পৃ. ১৬

৭. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭-১৯

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন হওয়া; কারণ পাগল কিংবা অবুঝ শিশুর বিবাহ শুদ্ধ নয়;
২. স্ত্রীর আকদ গ্রহণের উপযুক্ততা থাকা যেমন অন্য কারো স্ত্রী না হওয়া কিংবা স্থায়ীভাবে বিবাহ করা বৈধ নয় এমন নারী যেমন নিজ বোন অথবা সাময়িকভাবে বিবাহ করা বৈধ নয় এমন নারী যেমন নিজ স্ত্রীর বোন না হওয়া; অনুরূপভাবে সে অন্য স্বামীর ইদ্দত পালনকারিণী না হওয়া; কারণ তখন তার জন্যে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়।
৩. স্বামী-স্ত্রী উভয় নির্দিষ্ট হওয়া; কারণ এদের একজনও যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।
৪. বিবাহের শব্দ সরাসরি কনের দিকে সম্পর্কিত করা;
৫. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া; অর্থাৎ অভিভাবক ছাড়া নিজের বিবাহ নিজে করার জন্যে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ অভিভাবকের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর হয় না।
৬. স্বাধীন হওয়া; দাস-দাসীদের জন্যে তাদের মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ কার্যকর হয় না।[৮]
৭. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্যে বৈধ হবার ব্যাপারে শরীআতের কোন বাধা না থাকা। যেমন তাদের একজন মুসলিম আর অপরজন যদি মূর্তিপূজারী কিংবা অগ্নিউপাসক অথবা ধর্মত্যাগকারী বা প্রকৃত আসমানী ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তি হয়, তা হলে তাদের একজনের জন্য অপরকে বিবাহ করা শুদ্ধ হবে না। কারণ তাদের পরস্পরের বিবাহ করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-নিষেধ রয়েছে।[৯]

তৃতীয় প্রকার বিবাহের সাক্ষী সম্পর্কিত শর্তাবলী : বিবাহের আসরে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উপস্থিত থাকতে হবে। তবে সাক্ষীদের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে। যেমন- ১. বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন হওয়া; ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া; ৩. স্বাধীন হওয়া; ৪. মুসলিম হওয়া এবং ৫. ইজাব-কবুলের শব্দ শোনা।[১০]

বিয়ের হুকম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

তোমরা তোমাদের পছন্দমত নারী বিবাহ করো।[১১]

---

৮. প্রাগুক্ত. খ. ৪, পৃ. ১৯-২০

৯. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্‌*, কুয়েত : ওযারাতুল আওকাফ ওয়া শুয়ূনুল ইসলামিয়্যাহ্‌, ২য় সংস্করণ, খ. ৪১, পৃ. ৩০২

১০. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০-২১

১১. আল কুরআন, ৪ : ৩

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন-

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني

বিবাহ আমার সুন্নাত আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের অনুকরণ করলো না, সে আমার দলভুক্ত নয়।[১২]

ব্যক্তির অবস্থানুপাতে বিবাহের হুকম ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম হয়ে থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত।[১৩]

মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ

মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ তিন রকম হতে পারে। যথা :

ক. অমুসলিম পুরুষ কর্তৃক মুসলিম নারীকে বিবাহ;

খ. মুসলিম পুরুষ কর্তৃক আহলে কিতাবের নারী বিবাহ;

গ. মুসলিম পুরুষ কর্তৃক অন্যান্য অমুসলিম নারী যেমন মূর্তিপূজারিণী, অগ্নি উপাসিকা, মুরতাদ্দা, নাস্তিকা ইত্যাদিকে বিবাহ।

উপর্যুক্ত প্রত্যেক প্রকারের বিধি-বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. অমুসলিম পুরুষ কর্তৃক মুসলিম নারীকে বিবাহ

কোন মুসলিম নারীর জন্য কোন অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়। চাই সে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা মূর্তিপূজারী অথবা ধর্মদ্রোহী কিংবা কাফির হোক না কেন।[১৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

তারা (ঈমানদার মহিলারা) তাদের (কাফেরদের) জন্যে বৈধ নয় আর তারা (কাফিররা) ঈমানদার মহিলাদের জন্যে বৈধ নয়।[১৫]

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুমিন মহিলাদের সাথে কাফিরদের বিবাহ বৈধ নয়। এ বিষয়ে সকল ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন-

---

১২. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ফাদলিন নিকাহ, বৈরূত : দারুল ফিকর, হাদীস নং-১৯৪৬। হাদীসটির সনদ হাসান (حسن); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদীস নং-১৮৪৬

১৩. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০

১৪. ইমাম কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ি*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৯৮২ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৭২; ইমাম শাফিঈ, *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৩ হি, খ. ৫, পৃ. ৭; ইবন্ কুদামাহ, *আল-মুগনী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি., খ. ৭, পৃ. ৫৫৮; ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, ,তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৩০১

১৫. আল কুরআন, ৬০ : ১০

﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

তোমরা (তোমাদের ঈমানদার মেয়েদেরকে) মুশরিক পুরুষদের কাছে বিবাহ দিয়ো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে; (কেননা) একজন ঈমানদার দাসও একজন মুশরিক ব্যক্তির চেয়ে ভালো, যদিও এ মুশরিক ব্যক্তিটি তোমাদের ভালো লাগে। আসলে এরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকেই ডাকে আর আল্লাহ তাআলা তাঁর আদেশের মাধ্যমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকেই আহবান করেন এবং তিনি তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।[১৬]

ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযী রহ. বলেন, এ আয়াতে 'মুশরিক' দ্বারা সকল অমুসলিমকে বুঝানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।[১৭] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিম মহিলাদেরকে মুশরিক পুরুষদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন, অথচ ফকীহগণ বলেছেন যে, মুসলিম মহিলারা শুধু মুশরিক নয়; বরং ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী কোন পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়। এ কারণে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কীভাবে এ আয়াত দ্বারা অমুসলিম পুরুষদের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ বৈধ নয়? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম কাসানী রহ. বলেন, এ আয়াত আল্লাহ তাআলা মুশরিক পুরুষদের সাথে মুসলিম মহিলাদের বিবাহ নিষিদ্ধ হবার কারণ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾

তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে।[১৮]

কারণ তারা যদি মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তারা তাকে তাদের ধর্ম গ্রহণের জন্যে বলবে এবং তাদের ধর্মের দিকে আহবান করার অর্থ হলো কুফরির দিকে আহবান করা। আর কুফরির দিকে আহবান করার অর্থ হলো জাহান্নামের দিকে আহবান করা। এ কারণটি ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টানদের মধ্যেও রয়েছে। এ কারণে কোন মুসলিম মহিলার জন্য ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব চালাবার কোনো সুযোগ রাখেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾

---

১৬. আল কুরআন, ২ : ২২১

১৭. ইমাম রাযী, *মাফাতিহুল গাইব (তাফসীরে কাবীর)*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি., খ. ৬, পৃ. ৫২

১৮. আল কুরআন, ০২ : ২২১

> এবং কিছুতেই আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে মু'মিনদের ওপর কর্তৃত্ব চালাবার কোনো সুযোগ দেবেন না।[১৯]

যদি কোন কাফির কর্তৃক মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হয়, তা হলে কাফির মু'মিনের ওপর কর্তৃত্ব চালাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তো তাদের জন্যে এরূপ কোনো ব্যবস্থা খোলা রাখেন নি। বলা বাহুল্য, তারা যদি কোন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তারা তার উপর কর্তৃত্ব খাটাবেই। অথচ আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের ওপর কর্তৃত্ব চালাবার কোনো সুযোগ তাদের জন্য রাখেননি।[২০]

উল্লিখিত বিবাহ্ অবৈধ হবার হিকমত

নারীরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা কোমল ও নমনীয় হয়ে থাকে। তা ছাড়া স্বামীকে তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। কাজেই স্বামীদের আকীদা-বিশ্বাস ও পরিকল্পনার প্রতি মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, যদি একজন মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার 'আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে খুবই প্রবল। আল্লাহ তাআলার উপর্যুক্ত বাণী أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ-এর মধ্যে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামী শরীআতের একটি মূলনীতি হলো- ما يفضي إلى الكفر حرام-'যে পথ কুফরের দিকে নিয়ে যায়, সে পথ অবলম্বন করা হারাম।' অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ্ তার কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার একটি প্রবল সম্ভাবনাময় পথ। এ কারণে শরীআতে অমুসলিম পুরুষের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ্ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

খ. মুসলিম পুরুষ কর্তৃক আহলে কিতাবের নারী বিবাহ্

মুসলিম পুরুষ কর্তৃক আহলে কিতাবের নারী বিবাহ্ বৈধ কি-না-তা জানার পূর্বে আহলে কিতাবের পরিচয় জানা প্রয়োজন। তাই প্রথমে আহলে কিতাবের পরিচয় উল্লেখ করা হলো।

আহলে কিতাবের পরিচয়

'আহলে কিতাব' শব্দের অর্থ হলো ধর্মীয় গ্রন্থধারী। ইসলামী শরীয়তের আলোকে আহলে কিতাবের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা ইবন্ আবিদীন শামী, ইবন্ নুজাইম, ফখরুদ্দিন যায়লায়ী, মুফতি আমিমুল ইহ্সান মুজাদ্দিদী (আলাইহিমুর রাহমাহ্) প্রমুখ বলেন, যারা আসমানী ধর্ম এবং সেই ধর্মের আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করে, তাদেরকে 'আহলে কিতাব' বলা হয়। যেমন ইবরাহীম আ.-এর যে সকল অনুসারী ইবরাহীম আ.-এর উপর অবতীর্ণ সহীফাহ্ এবং তাঁর ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করে, যারা

---

১৯. আল কুরআন, ৪ : ১৪১

২০. ইমাম কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭২

দাউদ আ.-এর ধর্ম এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব যাবূরের প্রতি বিশ্বাস করে, তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান তাদের আসমানী ধর্ম এবং আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করে, তারাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত।[২১] ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নবী এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপর বিশ্বাস করবে, তাকে আহলে কিতাব বলা হয়। এ কারণে যে ব্যক্তি দাউদ আ.-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব যাবূরের প্রতি এবং ইবরাহীম ও শীছ আ.-এর উপর অবতীর্ণ সহীফাহ্ সমূহের প্রতি বিশ্বাস করবে, সেও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত।[২২]

আহলে কিতাব নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহের বিধান

আহলে কিতাব নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ। এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে সাহাবীগণের মধ্যে 'উমর আল-ফারূক রা. আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা মাকরূহ মনে করেন।[২৩] তা ছাড়া তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ রা.ও আহলে কিতাবের নারীকে বিবাহ করা সমীচীন মনে করতেন না। নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর রা.কে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাব দেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্য মুশরিক মহিলাদের হারাম করেছেন। আর কোনো মহিলা ঈসা আ. কে তার রাব্ব বলে ডাকবে, অথচ তিনি হলেন আল্লাহর একজন বান্দাহ। আমি এর চেয়ে বড় কোনো শিরক আছে বলে জানি না।[২৪]

অধিকাংশ ইমামের দলীল হলো- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ﴾

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে; যদি তোমরা তাদের মাহ্‌র প্রদান করো তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য।[২৫]

---

২১. ইবন্ আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৮; ইবন্ নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০; ইমাম যায়লায়ী, *তাবয়ীনুল হাকায়িক্ব*, কায়রো : আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ্, বূলাক্ব, ১ম সংস্করণ, ১৩১৩ হি., খ. ২, পৃ. ১১০; আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ্*, করাচি : দারু সাদাফ, সংস্করণ ও তা. বি., পৃ. ৫৮

২২. ইবন্ হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৯

২৩. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* খ. ১ পৃ. ৫৮৩

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আত-তালাক, হাদীস নং: ৪৮৭৭

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন-

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ

তোমরা তাদের (অগ্নি-উপাসক) সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় আচরণ করো; তবে তাদের মেয়েদের বিবাহ করো না এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খেয়ো না।[২৬]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আহলে কিতাব আর অগ্নি-উপাসকদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দুটি পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত : আহলে কিতাবদেরকে বিবাহ করা যাবে; কিন্তু অগ্নি-উপাসকদেরকে বিবাহ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত : আহলে কিতাবদের যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া যাবে; কিন্তু অগ্নি-উপাসকদের যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া যাবে না।

এ ছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম রা. ও অনেক কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করেছেন যেমন উসমান রা. 'নায়িলা' নামক এক খ্রিস্টান মহিলাকে, তালহা রা. এক ইয়াহুদী মহিলাকে এবং হুযাইফাহ্ রা. এক ইয়াহুদী মহিলাকে বিবাহ করেছেন; অথচ কোন সাহাবী কিংবা তাবিয়ী এ ধরনের বিবাহের বিরোধিতা করেন নি। এতে বুঝা যায় যে, কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ হবার ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[২৭]

তবে 'দারুল হারবের'[২৮] কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী, যদি সে ইসলামের বিধি-বিধানের সার্বভৌমত্ব মেনে না নেয়। কারণ সন্তানরা বিশেষ করে শৈশবকালে স্বাভাবিকভাবে মাকেই অনুসরণ করে থাকে। কাজেই সন্তানের মা যদি ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান বা অন্য নবীর অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে সন্তানরা যে তাদের মায়ের বিশ্বাসে বেড়ে ওঠবে, তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে তাদের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, একপর্যায়ে পৌঁছে তারা

---

২৫. আল-কুরআন, ৫ : ৫

২৬. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, দামিশ্ক : দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি., খ. ২, পৃ. ১৩৫; ইবন্ হাজার আসকালানী, *আত-তালখীসুল হাবীর*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি., খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; ইবনুল মুলকিন, *আল-বদরুল মুনীর*, রিয়াদ : দারুল হিজরাহ্ লিন্ নাশর ওয়াত তাওযি', ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি., খ. ৭, পৃ. ৬১৯; ইমাম জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি., খ. ২, পৃ. ৪১২

২৭. ইমাম জাস্সাস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৩

২৮. 'দারুল হারব' বলতে এমন মুসলিম রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়, যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কোনোরূপ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়নি এবং যেখানে প্রকাশ্যে অনৈসলামী বিধিবিধান চালু রয়েছে। দ্র. ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০, পৃ. ১৪

ইসলামকেই অস্বীকার করবে। এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।[২৯] যিম্মী[৩০] মহিলাকে বিবাহ করা মাকরূহে তানযীহী।[৩১] ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন, প্রয়োজন ব্যতীত তাদেরকে বিবাহ করা অনুত্তম।[৩২]

আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈসা এবং ওযাইর আ.-কে রব হিসেবে বিশ্বাস করে, তাদের প্রসঙ্গে শাইখুল আহনাফ আবু বকর খাহার যাদাহ্ রাহ. বলেন-

> وَيَجِبُ أَنْ لا يَأْكُلُوا ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا اعْتَقَدُوا أَنَّ الْمَسِيحَ إِلَهٌ وَأَنَّ عُزَيْرًا إِلَهٌ. وَلا يَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ. وَقِيلَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَلَكِنْ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلائِلِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الأَكْلُ وَالتَّزَوُّجُ
>
> আহলে কিতাবদের যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত না খাওয়া এবং কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ না করা ওয়াজিব, যখন তারা ঈসা এবং ওযাইর আ. কে ইলাহ্ হিসেবে বিশ্বাস করবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ মতের উপরই ফাতওয়া হয়েছে; তবে দলীলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া এবং তাদেরকে বিবাহ করা বৈধ হওয়া উচিত।[৩৩]

ইমাম আল-গাযালী রহ.-এর মতে, খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হবে, যদি সে ‘ঈসা আ. কে ইলাহ রূপে বিশ্বাস না করে। যদি সে ‘ঈসা আ.-কে ইলাহরূপে বিশ্বাস করে, তবে তাকে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

শামসুল আয়িম্মা আল-হালওয়ানী বলেছেন, ‘আহলে কিতাবের অনুসারীরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, সাধারণভাবে তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া বৈধ।’ বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহগণ যেমন ইবনুল হুমাম, ইবন্ নুজাইম, ফখরুল ইসলাম যায়লায়ী, ইবন্ আবিদীন শামী রহ. প্রমুখ বলেন, শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানীর উপর্যুক্ত বক্তব্য শাইখুল আহনাফ আবু বকর খাহার যাদাহ্র মত সমর্থন করে। তাঁদের বক্তব্য হলো- আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাথে বিবাহ বৈধ করেছেন শর্তমুক্তভাবে অর্থাৎ তিনি তাদের বিবাহ বৈধ হবার জন্যে এ শর্ত আরোপ করেননি যে, তাদের শিরকমুক্ত হতে হবে।[৩৪]

---

২৯. ইবন্ আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫; আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, *আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি., খ. ৪, পৃ. ৭৩; ইমাম সারাখসি, *আল-মাবসূত*, বৈরুত : দারুল ফিকর লিন্ নাশর ওয়াত্ তাবাআহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি., খ. ১০, পৃ. ১৬৩

৩০. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে যিম্মী বলা হয়। (ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল হাফনাভী, *মুজামু গারীবিল ফিক্হী ওয়াল উসূল*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি., পৃ. ২৫৬)

৩১. আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৩; ইবন্ আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫।

৩২. ইমাম ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৮

৩৩. ইমাম ইবনুল হুমাম ,প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৯; ইমাম ইবন নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০; ইমাম যায়লায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৯; ইবন আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫

৩৪. প্রাগুক্ত

আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন, কিতাবী মহিলা ঈসা আ.-কে ইলাহ মানলেও, তাদেরকে বিবাহ করা বৈধ।[৩৫] এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী কিতাবীরা ছিলো। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের যবেহ্‌কৃত প্রাণীর গোশ্‌ত এবং তাদের সাথে বিবাহ বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং তাদের সাথে বিবাহ এখনো বৈধ।[৩৬] ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন- 'তাছলীছ' অর্থাৎ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে যদিও তারা শিরক করে, তবুও তারা আল্লাহ তাআলার নিষেধ সম্বলিত ফরমান- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ তোমরা (মুমিনগণ) মুশরিক মহিলাদেরকে বিবাহ করো না"[৩৭]এর আওতাভুক্ত হবে না। কারণ তাদের বিষয়ে এ আয়াত অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে-

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ﴾

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে; যদি তোমরা তাদের মাহ্‌র প্রদান করো (তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য)।[৩৮]

উল্লিখিত বিবাহ বৈধ হবার হিকমত

মুসলিম পুরুষের সাথে আহলে কিতাবের বিবাহ বৈধ হবার মধ্যে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। যেমন :

এক. ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী রহ. বলেন, তাদের সাথে বিবাহ বৈধ করা হয়েছে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কারণ তারা তো পূর্ববর্তী নবী এবং আসমানী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে আর মুসলিমের সাথে তাদের বিবাহ হলে, মুসলিম ব্যক্তি তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারবে। হয়তো তারা ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করবে।[৩৯]

দুই. স্বভাবগতভাবে মহিলারা পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মহিলারা স্বামীর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। কারণ তারা অধিকাংশ সময় স্বামীর নিকটে থাকে আর তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চেষ্টা করে থাকে। এ কারণে মুসলিম পুরুষ যদি কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তারা হয়তো তাদের স্বামীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।[৪০]

---

৩৫. আলাউদ্দিন হাসকাফী, *আর-দুররুল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫

৩৬. আবদুল হাই লাখনাভী, *উমদাতুর রিয়াইআহ্*, মারকাযুল উলামায়িল আলামি লিদ্-দিরাসাতি ওয়া তাকনিয়াতিল মালুমাত, ১ম সংস্করণ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪৬

৩৭. আল-কুরআন, ২ : ২২১

৩৮. ইমাম ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২২৯

৩৯. ইমাম কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭০

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭১

তিন. মুসলিম পুরুষের সাথে তাদের বিবাহ হলে, তারা মুসলিমদের উদার আচার-আচরণ এবং ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানের সৌন্দর্যাবলি বুঝতে পারবে। এটি বুঝার জন্যে বিবাহই উত্তম ব্যবস্থা। কারণ ইসলামে পুরুষরাই মহিলাদের নের্তৃত্ব দিয়ে থাকে আর যখন মুসলিম পুরুষ কোন আহলে কিতাবকে বিবাহ করে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করে, তখন সেটি এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, মুসলিমরা শুধু অন্য মুসলিমের সাথে সুন্দর আচরণ করে না; বরং তারা সকল অমুসলিমের সাথে সুন্দর আচরণ করে। এতে ঐ কিতাবী স্ত্রী হয়তো স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।[৪২]

আহলে কিতাব মহিলাদেরকে বিবাহ করার সময় যে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ ইমামের মতে- মুসলিম পুরুষ কর্তৃক কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। এর ফলে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং এ বিবাহ আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের সেতু বন্ধন রচনা করতে পারে। সর্বোপরি উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে কাছে থেকে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ পাবে।

তবে এ বিবাহ বৈধ হবার জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে :

প্রথম শর্ত : সে কিতাবী মহিলা ব্যাপারে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে, সে বাস্তবিকপক্ষে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান প্রভৃতি আসমানী ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করে এবং সে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। সে নাস্তিক কিংবা ধর্মদ্রোহী হতে পারবে না এবং এমন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারবে না, যেটি আসমানী ধর্ম হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে পাশ্চাত্যের প্রত্যেক মহিলাই যে দু'জন খ্রিস্টান পিতা-মাতা থেকে জন্ম নেয়, তা নয়। বরং তাদের একজন খ্রিস্টান হয় এবং অপরজন অন্য ধর্মাবলম্বীর হতে পারে। তা ছাড়া যে সব মহিলা খ্রিস্টান পরিবেশে গড়ে ওঠে, তারাও নিশ্চিতভাবে খ্রিস্টান হবে এমন কথা নেই; বরং তারা কখনো কখনো নাস্তিক হয় আর কখনো তারা এমন অনেক মত ও দর্শনের ওপর গড়ে ওঠে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত; যেমন, বাহায়িয়্যাহ সম্প্রদায় প্রমুখ।

দ্বিতীয় শর্ত : কিতাবী মহিলা সতী-সাধ্বী হওয়া; অর্থাৎ এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হবে যে, তার নৈতিক মান ইসলামী নৈতিক মানে উত্তীর্ণ। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কিতাবী মহিলাকেই বিবাহ করার অনুমতি দেননি; বরং তাদের মধ্যে

---

৪২. ড. আব্দুল করীম যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮

কেবল সে সব মহিলাকেই বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন, যারা একান্তই সতী-সাধ্বী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾

সেসব কিতাবী মহিলাকে বৈধ করা হয়েছে, যারা সতী- সাধ্বী।[৪৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবন কাছীর রাহ. বলেন-

والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى:

﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾

এখানে 'মুহসানাত' শব্দ দ্বারা ব্যভিচার থেকে পূত-পবিত্রা মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেভাবে তিনি অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন- 'যারা সচ্চরিত্রা হবে, ব্যভিচারকারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়'[৪৪]।[৪৫]

আধুনিককালের প্রখ্যাত ফকীহ ড. ইউসুফ আল-কারাযাভী বলেন, 'কোন মুসলমানের জন্যে বৈধ নয় এমন মহিলাকে বিবাহ করা, যে স্বীয় লাগামকে পরপুরুষের কাছে সোপর্দ করে দেয়; বরং তাকে অবশ্যই সতী-সাধ্বী ও সন্দেহমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।'[৪৬] বিশিষ্ট মুফাসসির ইবন কাছীর রাহ.ও এ মত পোষণ করেন। তিনি এ মতকেই জমহুর উলামায়ে কিরামের মতরূপে উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

ইমাম হাসান আল-বাসরী রা. থেকে বর্ণিত, তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কোন মুসলিম পুরুষ কর্তৃক কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ কি-না? তিনি বললেন,

ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات ! فان كان لابد فاعلا فليعهد اليها حصانا غير مسافحة

তার ও আহলে কিতাবের এমন কী হলো যে, তারা একে অপরকে বিবাহ করবে! আল্লাহ তো মুসলিম নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর একান্তই যদি তাকে বিবাহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে এমন কিতাবী মহিলাকে যেন বিবাহ করে, যে সচ্চরিত্রা; ব্যভিচারকারিণী নয়।[৪৮]

তবে নিঃসন্দেহে আমাদের যুগে পশ্চিমা সমাজে এ প্রকারের নারী পাওয়া যাওয়া দুষ্কর; যা তাদের পরিসংখ্যান, রিপোর্ট এবং লেখনী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৯]

---

৪৩. আল-কুরআন, ০৫ : ০৫

৪৪. আল-কুরআন, ০৪ : ২৫

৪৫. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক : সামী বিন মুহাম্মাদ সালামাহ, রিয়াদ : দারু তীবাহ, ১৪২০হি. ১৯৯৯ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ৪২

৪৬. http://www.qaradawi.net/library/50/2363.html?tmpl-component&print-1&page

৪৭. ইমাম ইবনু কাছীর, প্রাগুক্ত

৪৮. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩, খ. ৩, পৃ. ২৫

৪৯. http://www.qaradawi.net/library/50/2363.html?tmpl-component&print-1&page

তৃতীয় শর্ত : কিতাবী মহিলা এমন সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়া, যারা মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে। এ কারণে ফুকাহায়ে কিরামের একদল হারবী মহিলা এবং যিম্মী মহিলার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা যিম্মী মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ আর হারবী মহিলার সাথে বিবাহ অবৈধ বলেছেন।[৫০] ইবন আব্বাস রা. থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন,

من نساء أهل الكتاب من يحلُّ لنا، ومنهم من لا يحلُّ لنا، ثم قرأ: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ)، [سورة التوبة: ٢٩]. فمن أعطى الجزية حلَّ لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه

কতক কিতাবী মহিলা আমাদের জন্য বৈধ আর কতক কিতাবী মহিলা আমাদের জন্য অবৈধ। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান না আনে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না আর সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়।"[৫১] (এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে) যারা জিয্য়া প্রদান করে, তাদের নারীরা আমাদের জন্য বৈধ আর যারা জিয্য়া প্রদান করে না, তাদের নারীরা আমাদের জন্য বৈধ নয়।[৫২]

ক্বাতাদা রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে । তিনি বলেন,

لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

চুক্তিবদ্ধ কিতাবী নারী ব্যতীত অন্যদেরকে বিবাহ করো না।[৫৩]

ইমাম যায়িদ বিন আলী-এর 'মাজমূ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি হারবী মহিলাকে বিবাহ করা মাকরূহ মনে করেন। এ গ্রন্থের ভাষ্যকার 'আর-রাওদুর নাদীর' গ্রন্থে বলেন, এখানে মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকরূহে তাহরীমী। কেননা তারা যিম্মী নয়। তিনি বলেন, একদল উলামায়ে কিরাম এটাকে মাকরূহ বলেছেন অর্থাৎ হারাম নয়। এর কারণ, আল্লাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতা। তিনি বলেন, -

---

৫০. ibid

৫১. আল-কুরআন, ৯ : ২৯

৫২. ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ানি ফী তা'বীলিল কুরআন*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি/২০০০ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৫৮৮; হাদীস নং-১১২৮৫

৫৩. আব্দুর রাজ্জাক আস-সনআনী, *আল-মুসান্নাফ*, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আল-আযমী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৪, ভূক্তি নং-১০০৮৬

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে।

কোন বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম আবু বকর আর-রাযী রহ. ইবন আব্বাস রা.-এর মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং তাঁর পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ এবং স্বীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে।[৫৪]

বলাই বাহুল্য, বৈবাহিক সম্পর্ক ভালোবাসার দৃঢ় প্রমাণ বহণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

তাঁর নিদর্শাবলীর একটি হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৫৫]

আল্লামা আবু বকর আর-রাযী রহ. বলেন, হারবী নারীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

(আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে এমন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না,) যারা আল্লাহ এবং স্বীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে।[৫৬]

এ আয়াতখানা হারবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা তাদের অবস্থা এবং আমাদের অবস্থার মধ্যে ঢের পার্থক্য রয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে কোন মুসলিমের জন্য কোন ইয়াহুদী নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এবং ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ বহাল থাকবে। বলা হয়ে থাকে যে, ইয়াহুদী এবং ইয়াহুদী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা প্রত্যেক ইয়াহুদীই ইয়াহুদী আন্দোলনের সমর্থক।[৫৭]

---

[৫৪] আল-কুরআন, ৫৮ : ২২
[৫৫] আল-কুরআন, ৩০ : ২১
[৫৬] আল-কুরআন, ৫৮ : ২২
[৫৭] http://www.qaradawi.net/library/50/2363.html?tmpl-component&print -1&page

চতুর্থ শর্ত : কিতাবী নারীকে বিবাহ করার পেছনে কোন ফিতনা-ফাসাদ এবং কোন নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকা; কেননা প্রত্যেক বৈধ বস্তুকে ব্যবহার করার জন্য শর্ত হচ্ছে সেই বস্তু ক্ষতিকারক না হওয়া। যদি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ঐ বৈধ বস্তু সাধারণভাবে ক্ষতিকারক, তাহলে তা থেকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হবে। আর যদি বিষেশভাবে ক্ষতিকারক হয়, তাহলে তা থেকে বিষেশভাবে নিষেধ করা হবে। ক্ষতির পরিমাণ যতই মারাত্মক হবে, হারাম ও নিষেধের মাত্রাও ততটুকু বৃদ্ধি পাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "যে কাজের মধ্যে কারো লাভ আছে; কিন্তু প্রতিবেশীর ক্ষতি রয়েছে, এমন বস্তুও শরীয়তে অনুমোদনযোগ্য নয়। আর যে কাজের মধ্যে কারো লাভ নেই, তাও অনুমোদনযোগ্য নয়"।[৫৮]

অমুসলিম নারীকে বিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ

যখন অমুসলিম নারীদের সাথে মুসলিম পুরুষের সামাজিকভাবে ও প্রকাশ্যে বিবাহ হয়, তখন তাদের সম সংখ্যক মুসলিম নারী বিবাহ থেকে বঞ্চিত হয়। আর বিশেষ করে বর্তমান যুগে একাধিক নারীকে বিবাহ করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও আবশ্যিকভাবে জ্ঞাতব্য যে, কোন মুসলিম নারীর জন্য কোন মুসলিম পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ নয়। অতএব, এ সমীকরণের এ ছাড়া কোনো সমাধান নেই যে, অমুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করার পথ রুদ্ধ করা হবে, যদি মুসলিম নারীদের ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা দেখা দেয়।

যে সব দেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় কোন কোন দেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়, সে সব দেশে শরীয়তের কাম্য হলো, অমুসলিম নারীকে মুসলিম পুরুষ কর্তৃক বিবাহ করা হারাম হওয়া। অন্যথায় পরিণতি এ দাঁড়াবে যে, মুসলিম নারীরা কিংবা তাদের একটি বড় অংশ এমন কোন মুসলিম পুরুষকে পাবে না, যে তাদেরকে বিবাহ করার জন্য এগিয়ে আসবে। আর তখন মুসলিম নারীর সামনে তিনটি বিষয় খোলা থাকবে। যথা : এক. অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করা; যা ইসলামে বৈধ নয়। দুই. পথভ্রষ্ট হওয়া এবং মন্দপথে চলা; যা কবীরা গুনাহ। তিন. বৈবাহিক জীবন থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হওয়া; এ তিনটি পথের কোনটিই ইসলাম সমর্থন করে না। এটিই হচ্ছে, মুসলিম পুরুষ কর্তৃক অমুসলিম নারীদের বিবাহ করার অনিবার্য পরিণতি।

---

৫৮. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : শুয়াইব আল-আরনাউত ও অন্যান্য, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-২৪৬৫। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, হাদীস নং-২৫০

আপন সংস্কৃতি, ভাষা এবং দেশ থেকে দূরে অবস্থানকারী কোন অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়, যা যে কোনো সাধারণ বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন লোকই বুঝতে পারে। যেমন কোন মুসলিম ইউরোপীয় নারী বা মার্কিন খ্রিষ্টান নারীকে বিবাহ করা। অনেক মুসলিম অধিকাংশ সময় ইউরোপ-আমেরিকায় যায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য অথবা সেখানকার কারখানায় প্রশিক্ষণের জন্য কিংবা সেখানকার প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য। আর তখনই তাদের একটি দীর্ঘ সময় সেখানে অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের কেউ কেউ বিদেশী স্ত্রী নিয়ে ফিরে, যার ধর্ম স্বামীর ধর্ম নয়, যার ভাষা স্বামীর ভাষা নয়, যার জাতীয়তা স্বামীর জাতীয়তা নয়, যার চিন্তাচেতনা স্বামীর চিন্তাচেতনা নয়। ঐ স্ত্রীদের কেউ কেউ স্বামীর দেশে থাকার জন্য সম্মত হলেও অধিকাংশই সম্মত হয় না। তার ঘরে তার পিতা-মাতা কিংবা ভাই অথবা তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে সে নিজেকে একান্তই অসহায় ভাবে। উপরন্তু, ঘরটি ইউরোপীয় কিংবা পাশ্চাত্যের চরিত্রে গড়ে ওঠে এবং ওই ঘরটি ম্যাডামের ঘর হিসেবে বিবেচিত হয়, মুসলিম ভাইয়ের ঘর হিসেবে নয়। ঐ ঘরে ঐ বিদেশী স্ত্রীই সর্বেসর্বা, যার উপর স্বামীর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে ওই ব্যক্তির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন সেখান থেকে চরম বেদনা এবং তিক্ততা নিয়ে তাদের গ্রামে কিংবা শহরে ফিরে আসে। আর তারা বুঝতে পারে যে, তাদের সন্তানকে তারা হারিয়ে ফেলেছে।[৫৯]

তাদের ঘরে সন্তান হলে তাদের দুঃখ আরো বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ সময় তাদের সন্তান যৌবনে পদার্পণ করে মায়ের ইচ্ছানুযায়ীই, পিতার ইচ্ছানুযায়ী নয়; যদিও তার কোন ইচ্ছা থেকে থাকে। এভাবে সন্তানরা তাদের মায়ের একান্ত কাছের হয়ে থাকে এবং তার দ্বারা অধিক হারে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে তারা যখন মায়ের দেশে জন্ম গ্রহণ করে। আর সেখানে ঐ সন্তানরা গড়ে ওঠে মায়ের ধর্মের উপরই। আর যদি তারা পিতার ধর্মে অবশিষ্টও থাকে, তাহলে তা শুধু নামেমাত্র, প্রকৃতপক্ষে নয়।[৬০]

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে ড. ইউসুফ আল-কারাযাভী বলেন, বর্তমান যুগে অমুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করা থেকে বারণ করা উচিত, যাতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির দিকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, শরীআতের একটি মূলনীতি হলো- دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة -'ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করা উপকার লাভের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়।' কাজেই অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা বৈধ হওয়ার বিষয়টি অতীব প্রয়োজন ব্যতীত অনুমোদনযোগ্য নয়। তাই প্রয়োজন অনুপাতে এ বিবাহ সীমিত থাকবে।[৬১]

---

[৫৯] http://www.qaradawi.net/library/50/2363.html?tmpl-component&print-1&page

[৬০] ibid

[৬১] http://www.qaradawi.net/library/50/2363.html?tmpl-component&print-1&page

গ. মুসলিম পুরুষ কর্তৃক অন্যান্য অমুসলিম নারী বিবাহ

মুসলিম পুরুষের সাথে সকল মুশরিক ও কাফির মহিলার বিবাহ অবৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾

তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে আর একজন মুমিন দাসীও মুশরিক নারী থেকে উত্তম; যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।[৬১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾

তোমরা (মুসলিমগণ) কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।[৬২]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সকল মুশরিক ও কাফির নারী যেমন, মূর্তিপূজারী, অগ্নি উপাসক, নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী, মুরতাদ্দ ইত্যাদিকে বিবাহ করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ফকীহগণের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মুসলিমের সাথে নাস্তিক ও বৌদ্ধ নারীদের বিবাহের বিধান

নাস্তিক মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কারণ তারা কোন ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়। ইমাম ইবন্ নুজাইম রহ. বলেন, 'নাস্তিকরা কাফির।'[৬৩] অনুরূপভাবে বৌদ্ধরাও নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারাও কোন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়। এ কারণে তারাও কাফির। আর কাফিরদের সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ নয়। ইমাম কাসানী রহ. বলেন-

لا يَجُوزَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْكَافِرَةَ

মুসলিম পুরুষের জন্যে কোন কাফির নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়।[৬৪]

মুসলিমের সাথে পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজারী নারীর বিবাহের বিধান

মুসলিম পুরুষের সাথে পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজারী যেমন হিন্দু নারীদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। কারণ তারা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করে মুশরিক হয়ে গেছে আর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾

তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে।[৬৫]

---

৬১. আল কুরআন, ০২ : ২২১
৬২. আল কুরআন, ৬০ : ১০
৬৩. ইমাম ইবন্ নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৩
৬৪. ইমাম কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭০
৬৫. আল কুরআন, ০২ : ২২১

ইমাম ইবন্ নুজাইম রহ. বলেন-

وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ كَالإِجْمَاعِ على حُرْمَةِ الْوَثَنِيَّةِ وَهِيَ الْمُشْرِكَةُ

অগ্নি-উপাসকদের সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ না হওয়ার উপর যেমন মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের ইজমা হয়েছে, তেমনিভাবে মূর্তিপূজারী নারীদের সাথেও মুসলিমের বিবাহ বৈধ না হওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে।[৬৬] মূর্তিপূজারীদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা সূর্য, নক্ষত্র, আগুন ইত্যাদির উপাসনা করে।[৬৭]

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন-

وَيَدْخُلُ فِي عَبَدَةِ الأَوْثَانِ عَبَدَةُ الشَّمْسِ وَالنُّجُومِ

নক্ষত্র আর সূর্যপূজারীরা মূর্তিপূজারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে-

لا يَجُوز نِكَاحُ الْمَجُوسِيَّاتِ وَلا الْوَثَنِيَّاتِ

মূর্তি-পূজারী এবং অগ্নি-পূজারী নারীদেরকে (কোন মুসলিম-এর জন্য) বিবাহ করা বৈধ নয়।[৬৯]

অগ্নি-পূজারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ

তোমরা তাদের (অগ্নি-উপাসক) সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় আচরণ করো; তবে তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করো না আর তাদের যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত খেয়ো না।[৭০]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অগ্নি-উপাসকদের বিবাহ করা যাবে না এবং তাদের যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া যাবে না। ইমাম ইবন্ নুজাইম রহ. তাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ হবার কারণ সম্পর্কে বলেন-

لأَنَّ الْمَنْعَ من نِكَاحِهِمْ لِكَوْنِهِمْ عَبَدَةَ النَّارِ فَهُمْ دَاخِلُونَ فِي الْمُشْرِكِينَ

তাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ হবার কারণ হলো তারা অগ্নি-উপাসক। আর তারা এ কারণে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।[৭১]

মুশরিকদেরকে বিবাহ করতে আল্লাহ তাআলা নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং হিন্দুদের মতো আরো যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করে তাঁর সাথে শিরক করে, তাদের সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়।

---

৬৬. ইবন্ নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০
৬৭. ইবন্ আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫
৬৮. ইমাম ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩১; ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০
৬৯. শাইখ নিজামসহ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১১ হি. খ. ১, পৃ. ২৮১
৭০. প্রাগুক্ত
৭১. ইবন্ নুজাইম. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০

মুরতাদের বিবাহের বিধান

কোন নারী কিংবা পুরুষ মুরতাদ হয়ে গেলে, তাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কারণ সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কাফির হয়ে গেছে আর কাফিরের সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম কিংবা অমুসলিম কারো সাথে তার বিবাহ বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে উল্লেখিত রয়েছে,

وَلا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً وَلا مُسْلِمَةً وَلا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مع أَحَدٍ

কোন মুরতাদ পুরুষের জন্যে মুরতাদ নারী বা মুসলিম নারী অথবা কাফির নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কারো সাথে কোন মুরতাদ নারীর বিবাহ বৈধ নয়।[৭৩]

অন্যান্য অমুসলিমের বিবাহের বিধান

উল্লিখিত অমুসলিম ছাড়াও আরো কতিপয় অমুসলিম কিংবা কাফির রয়েছে, যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয় যেমন যিনদীক্ব[৭৪], বাতিনিয়্যাহ্[৭৫], মুয়াত্তিলাহ্[৭৬] ও ইবাহিয়্যাহ[৭৭] ইত্যাদি।[৭৮]

---

৭৩. ইমাম সারাখ্সী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৮; ইমাম যায়লায়ী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৯; আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১০; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ২৮২। উল্লিখিত ইবারত (Text)টি ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার

৭৪. 'যিন্দীক' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে মনের ভেতরে কুফ্র লুকিয়ে রাখে এবং বাইরে নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে। এরূপ ব্যক্তির কোনো কোনো আমালের মাধ্যমে তার অন্তরের কুটিলতা ধরা পড়ে যায়। 'আল্লামা দাসূকী রহ. বলেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে এ ধরনের লোকেরাই মুনাফিক নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ফকীহগণ তাদেরকেই যিন্দীক নামে অভিহিত করেন। হানাফী ও কতিপয় শাফি'য়ী ইমামের মতে, যার কোনো দীন-ধর্ম নেই, সে যিন্দীক। শারী'আতের নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয়গুলোকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করাও যিন্দীকের একটি বিশেষ পরিচয়। (ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ.২১১)

৭৫. 'বাতিনিয়্যাহ' বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, কুর'আনের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হলো- যাহির, অপরটি হলো বাতিন। শারী'আতের অনুসারীরা যাহিরী অর্থের অনুসারী। তবে এ অর্থ তার আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং বাতিনী অর্থই হলো তার আসল উদ্দেশ্য। এ ধরনের 'আকীদা কুফ্র ও ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। কারামিতা, ইসমা'ঈলিয়্যাহ, নুসাইরিয়্যাহ, দুরূয ও বাহাই প্রভৃতি সম্প্রদায় 'বাতিনিয়্যাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। -সম্পাদক

৭৬. 'মুয়াত্তিলাহ' বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণসমূহ অস্বীকার করে। -সম্পাদক

৭৭. 'ইবাহিয়্যাহ' বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা শারী'আতের বিধিবিধান পালনকে প্রয়োজনীয় মনে করে না এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বিষয়গুলোকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করে। - সম্পাদক

৭৮. ইবনুল হুমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩১; ইবন নুজাইম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০

উপসংহার

বিবাহ একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনের নাম। এ সম্পর্কের বন্ধনটি শুদ্ধ হবার জন্য কতিপয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়; যেমন কোন মুসলিম পুরুষ কিতাবী কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবে; কিন্তু কোন কিতাবী পুরুষ কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করতে পারবে না। এভাবে কোন মুসলিম নারীর জন্য কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, যিনদীক, ধর্মবিদ্বেষী পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মোঃ মাসুদ আলম*

[**সারসংক্ষেপ :** *আধুনিক বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও যেমন দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি দিনদিন বেড়েই চলেছে নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ। বর্তমানে অন্যান্য সামাজিক অপরাধের মধ্যে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানো একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের বাজারগুলো এখন ভেজাল পণ্যে সয়লাব। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে পানীয়, শাক-সবজি, ফল-মূল, মিষ্টি, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রসহ এমনকি ঔষধেও ভেজাল মেশানো হচ্ছে। এর ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ জনসাধারণ এ বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত নয়। জনসাধারণ জানেন না যে, তারা প্রতিনিয়ত খাদ্যে বা পণ্যসামগ্রীতে কী ধরনের ভেজাল বা বিষক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে ভোক্তা ও ক্রেতাসাধারণকে প্রতারিত করছে। ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্যহানিকর প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে দেশের জনসাধারণ। জনস্বাস্থ্য দিন দিন মারাত্মক হুমকির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ, অটিস্টিক ও মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। অথচ বিশুদ্ধ, ভেজালমুক্ত পণ্য ও খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তি ভোক্তাসাধারণের আইনগত অধিকার। এমতাবস্থায় ভেজালমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পণ্যসামগ্রী প্রাপ্তি বাংলাদেশের গণমানুষের অন্যতম প্রত্যাশা। মানুষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর এ মানুষের জন্যেই মহান আল্লাহ্ পৃথিবীকে অফুরন্ত নিয়ামত দ্বারা সাজিয়েছেন, যাতে তারা সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। অথচ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ তাঁর যথাযথ পরিচয় পৃথিবীতে ধরে রাখতে পারছে না স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুকরণের কারণে। কুপ্রবৃত্তির কারণেই মানুষ শিরক, যুলম, মিথ্যা, সুদ-ঘুষ, মদ্যপান, ধর্ষণ, অপহরণ, জরবদখল, খুন-খারাবী ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। এসবের মতোই মানব সমাজের আরেকটি জঘন্যতম ঘৃণ্য অপরাধ হচ্ছে ভেজাল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হয়েছে।*]

পণ্য পরিচিতি

বাংলা একাডেমীর 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'- এ পণ্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে- বিক্রেয় দ্রব্য; বেসাত; মূল্য; মাসুল; ভাড়া।[১] সংকীর্ণ অর্থে পণ্য হলো কতগুলো

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯২, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ৭১৩

আপাত দৃশ্য (tangible) গুণের সনাক্তকরণযোগ্য (identifiable) সমাবেশ। এ অর্থে প্রতিটি পণ্যের সর্বজনবোধ্য একটি বর্ণনাত্মক নাম আছে; যেমন, আপেল, স্টিল বা ক্রিকেট ব্যাট ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে প্রতিটি পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন বাণিজ্যিক মার্কা (brand) হলো ভিন্ন ভিন্ন একটি পণ্য। অনুরূপভাবে ট্যাবলেটের উপরে মার্কায় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও স্কুইব-এর এ্যাসপিরিন ও বায়ার-এর এ্যাসপিরিন হলো দুটো পৃথক পণ্য। কোম্পানি মার্কার এই ভিন্নতা ভোক্তার কাছেও পণ্যে পণ্যে পার্থক্য সূচিত করে এবং এতে পণ্য-সংজ্ঞাতেও ভোক্তার কাঙ্ক্ষিত তুষ্টি সাধিত হয়।[২]

ভেজাল পরিচিতি

'ভেজাল' শব্দের অর্থ মিশ্রিত; মেকি; খাঁটি নয় এমন; উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ;[৩] যে খারাপ জিনিস অন্য ভালো জিনিসের সঙ্গে মিশানো হয়; খারাপ জিনিসের মিশ্রণ; বিশুদ্ধ নয় এমন।[৪] ইংরেজিতে ভেজালের প্রতিশব্দ উল্লেখ করা হয়েছে- To cheat, swindle; to double cross; to deceive, fool; delude; bluff, beguile; to trick, dupe; Gull.[৫] ভেজালের আরবি প্রতিশব্দ الغش (আল-গাশশু); الخداع (আল খিদাউ)।[৬]

প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে বস্তুর পরিচিতি যাই হোক না কেন, তাকে ভেজাল অথবা নকল যা-ই আখ্যা দেয়া হোক না কেন, বিষয়টি ধর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু মানুষ কর্তৃক দ্রব্যটি আংশিক বা পরিপূর্ণ যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন মানবসমাজে তখন বস্তুটি ভেজাল বা নকল নামে অভিহিত হয়।[৭] অতি মুনাফার লোভে মানুষ যখন রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে চায়, তখন তাকে যে অনৈতিকতা, অসততার শরণাপন্ন হতে হয়, তাকে 'ভেজাল' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৮]

ইসলামী পরিভাষায়- ভেজাল এমন কাজ বা বস্তু, যা তার মূলের বিপরীত। অর্থাৎ কোন বস্তুর দোষ, ত্রুটি গোপন করা, কাজে প্রবঞ্চনা করা, আসল কথা বা কাজের বিপরীত করাই হলো ভেজাল।[৯]

---

২. আবদুল্লাহ ফারুক ও অন্যান্য, *বিপণন তত্ত্ব*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ৩২৬

৩. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত) *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৬

৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, *সংসদ বাংলা অভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ২০০০, ৫ম সংস্করণ, দশম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৬৭০

৫. ড. রুহী আল-বালাবাক্কী, *আল-মাওরিদ* (আরবি-ইংরেজি অভিধান), দশম সংস্করণ, বৈরুত, পৃ. ৮০০

৬. আবু তাহের মেসবাহ, *আল মানার*, (আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান), প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ৯১০

৭. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, *হালখাতা*, (বিষয় ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর পরিণতি সংখ্যা,) আশরাফ সিকান্দার মোহ, "ভেজাল দ্রব্য- ভেজাল মানুষ", ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১০-মার্চ ২০১১, পৃ. ২৬

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

৯. *মাজাল্লা আদওয়াউ আশ-শারীয়া*, রিয়াদ, সংখ্যা ১৩, পৃ. ১১২

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের কারণ

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো-

১. **অতি মুনাফা অর্জনের মানসিকতা :** বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো, অতি মুনাফা অর্জন করার মানসিকতা। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষই তার অবস্থানগত দিক থেকে মনে করে, যেভাবেই হোক না কেন যত দ্রুত অর্থ উপার্জন করা যাবে, ততই ধনী হওয়া যাবে।[১০]

২. **রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। এ দেশের রাজনীতিতে পরিচ্ছন্নতা ও জবাবদিহিতা লক্ষণীয় ভাবে কম। এর বিরূপ প্রভাব জনজীবনের সর্বস্তরেই পড়েছে। ফলে খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে যে বিষ ঢালাওভাবে মেশানো হচ্ছে এবং তা বন্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ খুবই ক্ষীণ। পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উচ্চ আসনে পৌঁছতে না পারার কারণে এর প্রভাব কেমিক্যাল আমদানিকারক সকল পণ্যের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী এবং ভোক্তার মানসিকতার ওপর গিয়ে পড়েছে। সর্বগ্রাসী ভেজাল ও বিষক্রিয়ার এটি হলো প্রধানতম কারণ।[১১]

৩. **জনসাধারণের অসচেতনতা :** বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যসচেতন নয়। এ কারণে পণ্যে বা খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে তাদের সচেতনতা খুবই কম। এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্যে ভেজাল দিয়ে সরলবিশ্বাসী ক্রেতাসাধারণকে প্রতারিত করছে।

৪. **যথাযথ শাস্তি না হওয়া :** বাংলাদেশের হাট-বাজার ও বিপণী-বিতানগুলোতে প্রতিনিয়ত ভেজাল পণ্য কেনা-বেচা হলেও যারা পণ্যে ভেজাল দেয় তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয় না। ফলে পণ্যে ভেজালের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাই যথাযথ শাস্তি না হওয়াও বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

৫. **আইনের প্রয়োগ না থাকা :** পণ্যে বা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এ বিষয়ে বাংলাদেশে কঠোর আইন থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় না। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া পণ্যে ভেজালের অন্যতম কারণ।

---

১০. শওকত হোসেন ও শারমিন নিশাত সম্পাদিত, *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১১. *হালখাতা* কর্তৃক জানুয়ারি ৪, ২০১১ তারিখে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজের সাক্ষাৎকার। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬. **সস্তা ও সহজলভ্যতা :** পণ্য এবং খাদ্যসামগ্রীতে যেসব কেমিক্যাল ও ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তা বাংলাদেশে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য। ফলে ভেজাল মিশ্রণকারীরা খুব সহজেই পণ্য এবং খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ করে থাকে।

৭. **চটকদার বিজ্ঞাপন :** বাংলাদেশের হাট-বাজার ও বিপণী-বিতানগুলোতে বিজ্ঞাপননির্ভর চাকচিক্যময় প্রচুর পণ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় সাধারণ ভোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পছন্দ করতে হিমশিম খেতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে চটকদার বিজ্ঞাপন দারুণভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা কথার ফুলঝুরি আর স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রতিনিয়ত সাধারণ ভোক্তাগণকে প্রতারিত করছে।[১২]

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের স্বরূপ

বাংলাদেশে একসময় পণ্যে ভেজাল দেওয়া ছিল গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর মধ্যে সীমিত, আজ তা ঢুকে পড়েছে সমাজের সর্বত্র। ভেজাল পণ্য বাজারের সর্বত্র বিরাজমান। মুনাফালোভী মানুষ রাতারাতি অর্থ-বিত্তশালী হওয়ার লক্ষ্যে ভেজালের কারবার করে যাচ্ছে। প্রতারিত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এখানে সাধারণ-অসাধারণে কোন কথা নেই, পার্থক্য নেই। এক কথায় পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার শিকার সবাই।[১৩]

বাংলাদেশে ভেজাল পণ্য, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও ঔষধের কারণে দেশের প্রতিটা মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। উদাহরণস্বরূপ যে মিষ্টি বিক্রেতা মিষ্টির মধ্যে সোডিয়াম সাইক্লামেট, স্যাগারিন, কাপড়ের ও চামড়ার ক্ষতিকর রং ব্যবহার করে বিক্রি করছেন, সেই মিষ্টি বিক্রেতা বাজার হতে ফরমালিন দেয়া মাছ অথবা দুধ খাচ্ছেন অথবা ফরমালিন দেয়া মাছ বিক্রেতা বাজার হতে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশ্রিত বিস্কুট খাচ্ছেন অথবা তার বাচ্চাকে ক্ষতিকর রঙিন চকলেট খাওয়াচ্ছেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ ভেজাল পণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যের কারণে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।[১৪]

বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা হাট-বাজার ও বিপণী বিতানগুলোর পণ্যসামগ্রীতে ভেজালের মাত্রা বা স্বরূপ কেমন তা তুলে ধরতে Transparency International Bangladesh (TIB)-এর পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং সরকারিভাবে সরেজমিনে পরিচালিত ভেজালবিরোধী কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

১২. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (শাহ মোহাম্মদ কেরামত আলী ও কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন, "খাদ্য ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসা আইন",) *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭

১৩. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (আশরাফ সিকান্দার মোহ,) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

১৪. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (মোঃ রোকন-উদ-দৌলা, "খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর নানা দিক",) *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

প্রসঙ্গ-১ : বোতলজাত পানি : মোড়ক সর্বস্ব ব্যবসা

টিভিচিত্র, সংবাদপত্রে এবং পণ্যের লেবেলে মনলোভা বিজ্ঞাপন দিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী 'ন্যাচারাল মিনারেল' ও 'পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার' নামে বোতলজাত পানি বাজারজাত করলেও এসব পানির শতকরা ৯৮ ভাগই বিশুদ্ধ, জীবাণুমুক্ত বা ন্যাচারাল মিনারেল সমৃদ্ধ নয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে Bangladesh Standards and Testing Institutions (BSTI)-এর বিধিমালা অনুযায়ী মিনারেল ওয়াটার ও পিউরিফাইড ড্রিংকিং ওয়াটার প্রস্তুত করার জন্য বোতলজাত পানিতে স্বাস্থ্যসম্মত যেসব উপাদান থাকা বাধ্যতামূলক, অধিকাংশ পানিতেই সেসব উপাদানের উপস্থিতি নামমাত্র, আবার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক যেসব জীবাণু বা পদার্থ শোধন করা অপরিহার্য, সেসব জীবাণুর প্রকট উপস্থিতি রয়েছে এসব বোতলজাত পানিতে। ফলে মিনারেল ও বিশুদ্ধ পানির নামে বোতলজাত পানি কিনে ভোক্তারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন এবং মোটা অংকের অর্থের অপচয় করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত এক গবেষণায় দেশের পানি উৎপাদনকারী শিল্পের উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে ওঠে।[১৫] দেশের প্রথম সারির পানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জনপ্রিয় ব্রান্ডের পানিও এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জানা যায়, পানির মান যাই হোক বাজারে পাওয়া নিম্নমানের প্রায় সবকটি পানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই দেশের একমাত্র পণ্যদ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বি.এস.টি.আই-এর ছাড়পত্র পেয়েছে। বোতলজাত পানি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াসার পানি ব্যবহার করে। তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি, ডিপ টিউবওয়েল নেই।

গবেষকগণ বলেছেন, বোতলজাত পানির চেয়ে জারের পানির অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। হালে বোতলের পাশাপাশি এখন বাসা বাড়িতেও 'জার কালচার' শুরু হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ অফিস আদালতে এখন জারের পানি পান করা হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, শুধু ঢাকা মহানগরীতেই প্রতিদিন ৬ থেকে ৭ হাজার বড় জারের পানি বিক্রি হচ্ছে। পানি উৎপাদনকারীদের ক্রমশ জারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ অনুসন্ধানে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। কোম্পানীগুলো জানায়, বোতলের পানি বাজারজাতে উৎপাদন খরচ বেশী। একটি জার না ভাঙ্গা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বোতল দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না। ফলে বোতলজাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। জারের পানি সরাসরি ভোক্তার হাতে অর্থাৎ অফিস আদালতে চলে যাওয়ায় অভিযান চালিয়েও ধরা সম্ভব হয় না। আবার মান

---

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, টি আই বি পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১৯৯৭-২০০৭, ঢাকা : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৩

পরীক্ষার জন্য এসব পানি বাজারেও খুঁজে পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা এ কারণেই কোম্পানীগুলো জারের পানির দিকে ঝুঁকে পড়ছে।[১৬]

প্রসঙ্গ-২ : ভোজ্য তেলে ভেজাল

ভেজাল ভোজ্য তেলে দেশের বাজার এখন সয়লাব। বাজারে বিভিন্ন জাতের ও ব্রান্ডের অতিস্নেহের পদার্থ এ ভোজ্য তেলের তেলেসমাতিতে আসল-নকলের ফারাক প্রায় উঠে গিয়েছে। বাজারে বিক্রীত সরিষার তেল, সয়াবিন, বাটার অয়েল, ঘি অধিকাংশই ভেজাল। অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের সাথে মাস্টার এসেন্স হিসেবে সুপরিচিত এ্যালিলি সোথায়োসায়ানাইডসহ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে তৈরী করা হয় 'খাঁটি সরিষার তেল'। অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঝাঁঝ ও রঙ মিশিয়ে সয়াবিন তেলকে সরিষার তেলে রূপান্তরিত করা হয়। এই তেল ডেকচি বা কড়াইতে ঢালার পর গরমে অধিক হারে ফেনা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তেল লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সারসহ সকল পেটের পীড়া ও চর্মরোগের অন্যতম কারণ।

'সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলমুক্ত' এ লেভেল বড় ধরনের এক রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। গরুর চর্বি, তেল ও আলু মিশিয়ে তৈরী করা হয় ভেজাল বাটার অয়েল। দেশের বিভিন্ন এলাকার মিলের পঁচা পাম অয়েল ও পঁচা সরিষার তেল এবং বিষাক্ত পাম স্টিয়ারিন মিশিয়ে তৈরী হয় সয়াবিন। চটকদার লেবেল লাগিয়ে '১০০ ভাগ খাঁটি তেল' হিসেবে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। এ তেলের বোতল-কৌটায় লাগানো হয়ে থাকে বি.এস.টি.আই-এর নির্ভেজাল সার্টিফিকেট।[১৭]

প্রসঙ্গ-৩ : হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্যে ভেজাল

বেশীরভাগ হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভেজাল খাদ্যের ছড়াছড়ি। গরুর নামে মহিষের মাংস, খাসির নামে বকরী-ভেড়ার মাংস আর পঁচা-বাসি ময়লাযুক্ত খাবার হোটেল-রেস্তোরাঁয় প্রচুর বিক্রয় হচ্ছে। এমনকি মরা মুরগীর মাংসও দুষ্প্রাপ্য নয়। অধিকাংশ হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। নোংরা-স্যাঁতসেঁতে গন্ধময় পরিবেশে রান্না-বান্না হয়। হোটেলে ব্যবহৃত ডেগ-ডেগচি, হাঁড়ি-পাতিল, কড়াই, থালা-বাসন, গ্লাস, কাপ-পিরিচ, চামচ ভালভাবে পরিষ্কার করে ধোয়া মোছা হয় না। হোটেল-রেস্তোরাঁয় এই সমস্ত খাবার খেয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত আমাশয়, ডায়রিয়া, ফিতা ক্রিমি এবং হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে।[১৮]

প্রসঙ্গ-৪ : ঔষধে ভেজাল

সারাদেশে ভেজাল-নকল, নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ নির্বিঘ্নে বিক্রয় হচ্ছে। নিরাময় ও জীবন রক্ষাকারী ভেজাল ঔষধ যেন জীবনবিনাশী 'পয়জন'-এ পরিণত

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১

১৮. প্রাগুক্ত. পৃ. ২২৬

হয়েছে। ঔষধের বাজারে কোনটি আসল আর কোনটি নকল তা অনেক সময় দোকানীরাও চিনতে পারেনা। কেবল ঢাকা শহরে নয়; সমগ্র দেশে বেশুমার 'নকল' ঔষধ তৈরীর কারখানা রয়েছে। সরকার সম্প্রতি নকল ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ বাজারজাত করার অভিযোগে দেশের ১৭টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর অধিকাংশই রাজধানীর বাইরে অবস্থিত।

বিভিন্ন ব্রান্ডের ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ, স্যালাইন এবং ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সই বেশি নকল ও ভেজাল হচ্ছে। এরারুটের সাথে এক ধরনের কৃত্রিম আঠালো পদার্থ মিশ্রণ করে তৈরী হয় ট্যাবলেট আর আবরণের মধ্যে ডালের বেসন ভরে ক্যাপসুল তৈরী করা হয়। স্যালাইনের প্যাকেটে ভরা হয় পরিষ্কার পানি। মিহি করে বাটা চিনির সাথে ময়দা মিশিয়ে তৈরী করা হয় ডেক্সট্রোজ (গ্লুকোজ)। এই সকল নকল-ভেজাল ঔষধ দেশের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা বাজারজাত করছে। বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন খ্যাতনামা ঔষধ কোম্পানীর ঔষধের লেবেল ছাপিয়ে তা শিশির গায়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কারও বুঝারও উপায় থাকেনা যে, এটা 'নকল' ঔষধ।

এ ভেজাল ঔষধ সাম্রাজ্যে একশ্রেণীর হেকিমি ব্যবসায়ও দেশে জমজমাট। বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় সর্বরোগের মহাঔষধের চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা মানুষকে প্রকাশ্যে প্রতারণা করছে। তাদের অশ্লীল বিজ্ঞাপনের ওপর সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলেও ভাষার মারফোলজিতে তারা আরও অশ্লীল বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।[১৯]

প্রসঙ্গ-৫ : গুঁড়া দুধ ও মিষ্টিতে ভেজাল

রসনাতৃপ্ত রসগোল্লা, কালোজাম, জিলিপি, পানতোয়া, চমচম, সন্দেশ, মিহিদানা, প্যাড়া প্রভৃতি তৈরীতে এখন খাঁটি দুধের বদলে নিম্নমানের গুঁড়াদুধ, চিনির বদলে স্যাকারিন আর ফুডকালারের পরিবর্তে কৃত্রিম ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা হচ্ছে। খাঁটি ছানার তৈরী-রস-টসটসে রসগোল্লা মিলছে না। আর ভেজালের আবর্তে দেশের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারগুলো ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ঢাকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ মিষ্টি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানেও লেগেছে ভেজালের ছোঁয়া। মহাখালী জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের খাদ্য পরীক্ষাগারে গত ১০ বছরে পরীক্ষিত একটি মিষ্টির নমুনাতেও খাঁটি পাওয়া যায় নি।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, আমদানীকৃত গুঁড়া দুধ দ্বারাই বেশিরভাগ মিষ্টান্ন তৈরী করা হচ্ছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ নষ্ট গুঁড়া দুধও ব্যবহৃত হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন ৬টি নামকরা মিষ্টি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ভেজাল মিষ্টির পাশাপাশি ঢাকাতে 'নকল' মিষ্টি ব্যবসায়ও জমজমাট। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম, বগুড়া ও গৌরনদীর দই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিষ্টি, কুমিল্লার

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১

রসমালাই, খাঁটি ও ভেজাল দুই ভাবেই বিক্রয় হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মিষ্টিতে ব্যবহৃত ক্ষতিকর কাপড়ের রং ফুড পয়জনিং-এর সৃষ্টি করে। এই রং খাবার ফলে ছোট রোগ হতে ক্যান্সার ও কিডনি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।[২০]

প্রসঙ্গ-৬ : ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীতে ভেজাল

বাজার ভর্তি অবিকল আসল ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আদলে তৈরী নকল টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট প্লেয়ার, রেডিও, ভিসিপি, ভিসিআর, টেবিল ফ্যান কিনে ক্রেতারা রোজ ঠকছেন। জিঞ্জিরা, নবাবপুর ধোলাইখাল, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, স্টেডিয়াম পাড়া, ইসলামবাগ, হাজারীবাগ, মীরহাজিরবাগ ও বাড্ডা এলাকায় গড়ে ওঠা অসংখ্য দুই নম্বর 'মেড ইন জাপান,' 'মেড ইন চায়না' ও 'মেড ইন কোরিয়া' কারখানার নকল ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ভিড়ে আসল-নকল চেনা দায়। এ সকল কারখানায় যে সমস্ত সামগ্রী তৈরী হয় সেগুলোর বেশীরভাগ খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানী করা হয় ভারত, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের অখ্যাত কোম্পানী হতে। ভারত হতে চোরাপথে সর্বাধিক পরিমাণ 'নকল' যন্ত্রাংশ আসে। এ সকল বিদেশী যন্ত্রাংশের সাথে দেশে তৈরী অত্যন্ত নিম্নমানের যন্ত্রাংশ, বহিরাবরণ প্রভৃতি দিয়ে তৈরী করা হয় অবিকল আসল ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর মত সামগ্রী। এ সামগ্রীর লেবেল ও কার্টন আসলটির মতই থাকে। এই ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর গায়ে আসলের মত টাইপ দিয়েই স্ক্রীনপ্রিন্ট করে "MADE IN JAPAN," 'MADE IN CHINA' লিখে দেওয়া হয়।

এ প্রতারণা এখন প্রায় 'ওপেন সিক্রেট'। কিন্তু অনভিজ্ঞ ক্রেতাদের বুঝবার উপায় নেই। নকল জিনিসের দাম আসলের চেয়ে কম হওয়ায় অনেক ক্রেতা ভেজাল এবং নকল সামগ্রী ক্রয়ের ফাঁদে পা দেন। জাপান ভিত্তিক আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত একটি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর এদেশীয় স্বত্বাধিকারী জানান, জাপানে শ্রমিক মজুরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক খরচ আকাশ ছোঁয়া। এ কারণে জাপানে কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রীর দাম পড়ে যায় বেশী। জাপান তাদের পণ্যের কোয়ালিটি অক্ষুণ্ন রেখে উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ভিসিআর, ভিসিপি, সিডিসেট, ডেকসেট, রেডিওসহ এই জাতীয় কারখানা অন্যদেশে সরিয়ে নিয়েছে। জাপানে এখন উল্লিখিত জাতীয় ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী খুব একটা তৈরী করা হয় না। তিনি জানান, প্রতিদিন বিখ্যাত ইলেকট্রনিক্স কোম্পানীর সার্ভিস সেন্টারে যে টিভিগুলো মেরামত করার জন্য আনা হয় তার ৫০ ভাগই 'দুই নম্বর' পণ্য।[২১]

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২

বাংলাদেশে সরেজমিনে পণ্যে ভেজালের চিত্র

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের স্বরূপ বোঝাতে ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রোকন-উদ-দৌলা কর্তৃক সরেজমিনে পরিচালিত কয়েকটি অভিযানের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।[২২]

১. **কার্বাইড দিয়ে আম পাকানো** : আমের ঝুড়িতে আমের মাঝখানে এক টুকরো কার্বাইড অথবা কার্বাইড গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কার্বাইডের তেজস্ক্রিয়তায় আম আগুনের মতো গরম হয়ে যায় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও পেকে যায়।

২. **কেমিক্যাল দিয়ে কলা পাকানো** : ড্রামভর্তি কেমিক্যাল মিশ্রিত পানির মধ্যে কলার ছড়াকে চুবিয়ে তোলার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফলে কলার কোন ঘ্রাণ ও স্বাদ পাওয়া যায় না।

৩. **খাবারে ভেজাল** : হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ফার্স্টফুড, ডাইনিং, ক্যান্টিন, চাইনিজ সর্বত্রই পঁচা, বাসি খাবারের পাশাপাশি পোড়া তেল, রং ব্যবহার, কেমিক্যাল, গোলাপজল খাবারে ব্যবহার, কিচেনে আবর্জনার স্তূপ, একই ফ্রিজে রান্না খাবার, কাঁচা মাছ-মাংস, বাটা কাঁচা মসলা, বাসি খাবার রাখা হয়।

৪. **বিস্কুট ফ্যাক্টরি ও বেকারিতে ভেজাল** : বিস্কুট ফ্যাক্টরি ও বিভিন্ন বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করে দেখা যায়, সেখানে তৈরি পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রীতে ক্ষতিকর রং, নামবিহীন, লেবেলবিহীন বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, ইউরিয়া, অ্যামেনিয়া, বাইকার্বোনেট, সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, সোডিয়াম সাইক্লামেট, পঁচা ডিম, ভেজাল ঘি, তেল, ফ্লেভার, সুগন্ধি কেমিক্যাল ইত্যাদি ভেজাল মিশ্রণ দেয়া হয়েছে।

৫. **মিষ্টিতে ভেজাল** : ঢাকা শহরের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে পঁচা বাসি কিমা, দুর্গন্ধযুক্ত বাটার এবং টেক্সটাইল মিলের রং পাওয়া যায়। রঙের কৌটায় লেখা ছিল Use for only textile.

৬. **চকলেট ও আইসক্রিমে ভেজাল** : ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোড ও নবাবের দেউরিতে অভিযান চালিয়ে দেখা যায়, কয়েক প্রকারের ডাইং রং ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে চকলেট ও আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে।

৭. **পানিতে ভেজাল** : ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে দেখা গেছে, ওয়াসার পানিকে মিনারেল ওয়াটার বিশুদ্ধ পানি হিসেবে বোতলজাত ও পরিপ্যাক করা হচ্ছে কোনো রকমের শোধন ছাড়াই।

৮. **শুটকিতে ভেজাল** : ঢাকা শহরের কারওয়ান বাজারে ৪৭টি শুটকির আড়ৎ ও দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ক্ষতিকর ডিডিটি পাউডারযুক্ত শুটকি পাওয়া যায়।

---

[২২] শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (মো. রোকন-উদ-দৌলা, "আমাদের স্বপ্ন ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যের বাংলাদেশ",) *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯২

৯. **গুঁড়ো দুধে ভেজাল** : ঢাকা শহরের মহাখালীতে অভিযান করে গুঁড়ো দুধে চালের গুঁড়ো, ইটের গুঁড়ো এবং তরল দুধে ফরমালিন পাওয়া যায়।

১০. **চাল ও মুড়িতে ভেজাল** : ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ধান তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করতে, চাল ও মুড়িকে ধবধবে সাদা করতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১১. **ঔষধে ভেজাল** : ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটে অভিযান পরিচালনা করে ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনবিহীন ভেজাল ঔষধ ও স্যালাইন পাওয়া যায়।

১২. **গোশতে ভেজাল** : ঢাকা শহরে প্রতিদিন শতশত মহিষ জবাই করা হলেও কোথাও মহিষের মাংস পাওয়া যায় না। মহিষের মাংসকে গরুর মাংস বলে এবং ভেড়ার মাংসকে খাসির মাংস বলে বেশি দামে বিক্রি করার প্রতারণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

১৩. **বি.এস.টি.আই-এর লাইসেন্সবিহীন পণ্য** : ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাজারে সরিসার তেল, নারিকেল তেল, অনুমোদনবিহীন মধু, ঘি, বিদেশি কসমেটিক, দুধ, স্যাম্পু, চকলেট, টুথপেস্ট, সাবান, জুস, নুডুলস, তেল, সস, বিস্কুট, লজেন্স, গুঁড়ো দুধ, চিনি, পামওয়েল, ভেজিটেবল ওয়েল ইত্যাদি পাওয়া যায়। অথচ উক্ত পণ্যগুলো বি.এস.টি.আই-এর গুণগত মান পরীক্ষিত নয় এবং লাইসেন্সবিহীন।

পণ্যে ভেজালের ক্ষতিকর দিক

পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশানো কেবল বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত নয়, এটি এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ক্ষতিকর। এটা পৃথিবীব্যাপী একটি মারাত্মক ব্যাধি। বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলোর উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. **স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া** : পণ্য ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজালের কারণে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ভেজাল পণ্য ব্যবহারের ফলে মানুষ ক্যানসার, হৃদরোগ, স্নায়ু রোগ, ডায়াবেটিস, নিদ্রাহীনতা, পক্ষাঘাত, পেটের পীড়া, মাথাব্যাথা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে কঠোর আইন থাকলেও এর বাস্তবায়ন নেই। ফলে পণ্যে ও খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীরা গোটা জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এতে দেশের জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যই আশঙ্কাজনকভাবে হুমকির মুখে। তাই ভেজাল প্রতিরোধে যে খাদ্য আইন হয়েছে অতিসত্বর তার সঠিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জরুরি।

২. **জটিল ও কঠিন রোগ সৃষ্টি :** বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী এবং শাক-সবজিতে যে ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তথা ভেজাল ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব ভেজালযুক্ত খাদ্য ও পণ্য ব্যবহারের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, জণ্ডিস, মেদবহুলতা প্রভৃতি জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। হৃদরোগ, ক্যানসার ও স্ট্রোক বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে এসব রোগের মূল কারণ ভেজালমিশ্রিত ভোজ্যতেল এবং পণ্য ও খাদ্যসামগ্রী।[২৩]

৩. **ভেজাল পণ্য শিশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর :** পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল শিশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শিশুরা সুস্থ-সুন্দরভাবে গড়ে উঠুক তা সবাই কামনা করে। কিন্তু পণ্য ও খাদ্যের ভেজাল কারবারিরা শিশুস্বাস্থ্যকে তাদের ভেজালের ব্যবসার বলি করে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে বাংলাদেশের ভবিষ্যতকেই অন্ধকার করে দিচ্ছে। শিশুদের এই স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিকটি দেশ-জাতির ভবিষ্যতকে সমানভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।[২৪]

৪. **অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা :** ভেজাল খাদ্য ও পানীয় ব্যবহারের ফলে তরুণ সমাজের অস্থিরতা ও ক্ষুধামন্দা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে দেখা দেয় নেশা ও অপরাধ প্রবণতা। তরুণ সমাজের এহেন অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা জাতির জন্য চরম ক্ষতির কারণ বলে গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীগণের অভিমত।

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন-কানুনসমূহ

বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধে প্রচুর আইন (Laws), অ্যাক্টস (Acts), অধ্যাদেশ (Ordinances), মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ (President Order), বিধি-বিধান (Rules) বিদ্যমান আছে। প্রয়োজন শুধু এসব বিদ্যমান আইন-কানুনসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। প্রচলিত আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিসমূহ সততা, আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলে বাংলাদেশে পণ্যে ভেজালের সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে বাধ্য। আমাদের অনেক আইন আছে, যেগুলোর প্রয়োগ নেই। আবার অনেক আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। তাই বলা যায়, পণ্যে ভেজাল ও নকল প্রতিরোধে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আইন-কানুন বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু এসব সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা। বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন-কানুনসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

---

২৩. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (নাজমা শাহীন, "খাদ্যে ভেজাল",) *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২৪. শওকত হোসেন ও শারমীন নিশাত সম্পাদিত, (আশরাফ সিকান্দার মোহ.) *হালখাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

ক. **১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি :** বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল প্রতিরোধে সবচেয়ে পুরাতন আইন ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধি ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ধারায় এ বিষয়ে শাস্তির বিধান যথাক্রমে ছয়মাস কারাদণ্ড বা একহাজার টাকার অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান আছে।[২৫] তবে এসব আইনে যেমন মামলা হয় না; তেমনি আইন প্রয়োগও হয় না। বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে উপরিউক্ত দণ্ডবিধিগুলোর ব্যাপক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়। উক্ত ধারাগুলোতে শাস্তি কম হলেও কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয় ধারা মিলে ১ (এক) বছর কারাদণ্ড দেয়া শুরু হলে ভেজালকারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হয়।

খ. **১৯৫৯ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ :** পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের দ্বিতীয় আইন ১৯৫৯ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ যা ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়।[২৬] এই অধ্যাদেশে ভেজালকারীদের শাস্তি তিন লক্ষ টাকা, ১ (এক) বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দোকান বা কারখানার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে।

গ. **১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন :** বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ এবং প্রসাধনসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধে সবচেয়ে শক্তিশালী আইন হচ্ছে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন। এই আইনে ভেজাল কারবারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ১৪ (চৌদ্দ) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে।[২৭]

ঘ. **বি.এস.টি.আই অধ্যাদেশ ১৯৮৫ :** বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ১৯৮৫ সালে বি.এস.টি.আই অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যা ২০০৩ সালে সংশোধন করা হয়। এতে ভেজাল কারবারীদের সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং মালামাল বাজেয়াপ্ত ও কারখানা বন্ধ করে দেয়ার বিধান করা হয়।[২৮]

উপরোক্ত আইনগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধে ২০০৫ সাল থেকে ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট চালু করা হয়। অপরাধের ধরনভেদে এ কোর্ট তাৎক্ষণিক জরিমানা ও শাস্তি দিয়ে থাকে।

---

২৫. Dr. Hari Singh Gaur, *Penal Law of India*, Vol-2, p. 1924

২৬. *Bangladesh Pure Food Ordinance Amendment-2005*

২৭. *Bangladesh Special Power Act- 1974*

২৮. *The Bangladesh Standard and Testing Institution Ordinance 1985*

ভেজাল প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই তার রয়েছে সুন্দর, সুস্পষ্ট, যথার্থ ও বিজ্ঞানসম্মত দিক নির্দেশনা। ইসলামে ভেজাল একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তাই ভেজাল বলতে কেবল পণ্য সামগ্রীতে বর্জ্যপদার্থ, ভিনজাতীয় পদার্থ বা বিষ মিশানোকেই বুঝায় না। বরং ব্যবসায়িক লেন-দেন তথা ক্রয়-বিক্রয়ে বস্তুর দোষ-ক্রটি গোপন করা, ওজনে কম দেয়া, মিথ্যা তথ্য দেয়া, ধোঁকা দেয়া, আসল কথার বিপরীত করা, ভালো মানের পণ্যতে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ দেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। আর খাদ্যসামগ্রী ও পণ্য সামগ্রীতে এ ধরনের ভেজাল দেয়া ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। ভালো কোন কিছুর সাথে মন্দ কোন কিছু মেশানোকে মহান আল্লাহ্ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

হে আহলে কিতাবগণ![29] কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছো এবং সত্যকে গোপন করছো, অথচ তোমরা তা জান।[30]

ইসলাম পূত-পবিত্র পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রী এবং মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা হালাল বা বৈধ করেছে। আর যেসব খাবার অকল্যাণকর তা হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা-

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[31]

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর প্রতি তোমরা মু'মিন।[32]

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।[33]

---

২৯. মূলত তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী তথা মূসা এবং ঈসা আ. এর অনুসারীগণকে আহলে কিতাব বলা হয়।

৩০. আল-কুরআন, ৩ : ৭১

৩১. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

৩২. আল-কুরআন, ৫ : ৮৮

৩৩. আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল ঘোষণা করেছেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।[৩৪]

আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে জীবিকা তথা ভোগের ব্যাপারে 'হালাল' ও 'তায়্যিব' বা পবিত্র এ দু'টি নীতি উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫] ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য পবিত্র হতে হবে। পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, অনুরূপ অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন খাদ্যসামগ্রী ভোগ করতে হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"।[৩৬]

পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর খাবারের সাথে ভেজাল মিশিয়ে অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরী করা, বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থ এমনকি রোগাক্রান্ত হওয়ার মত দূষিত উপকরণ মিশিয়ে খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী তৈরি করা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যারা এসকল কাজ করে তারা দেশ ও জাতির বড় শত্রু। ইসলামের দৃষ্টিতে এরা মস্তবড় পাপী ও অপরাধী। কেননা এটি একটি হারাম কাজ। এভাবে ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে হালাল পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে তা হারাম করার সকল পন্থা ইসলামে নিষিদ্ধ। তা ক্রয়-বিক্রয় হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক, কোন ক্রমেই জায়িয নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে, সব ব্যাপারেই মুসলিম সততা ও ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করবে।[৩৭]

খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী নষ্ট করা, হালাল খাবারে হারাম উপাদান মিশিয়ে তা হারাম করা, ব্যবসায় মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেয়া, অত্যধিক প্রশংসা বা কসম করে পণ্য বিক্রি করা ইত্যাদি ইসলামের বাণিজ্যনীতি পরিপন্থী। যারা বিভিন্ন কৌশলে খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে ব্যবসা করে তারা গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। এ কারণে ইসলাম তাদের এহেন অপরাধের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিভিন্ন রকমের শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

---

৩৪. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

৩৫. মাওলানা হিফজুর রহমান, (মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত), *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৪৪

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আত-তহারাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল অযু, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৪০; হাদীস নং-৫৫৬

৩৭. ইউসুফ আল-কারাযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান,* ভাষান্তর মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৯

তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারেনা।[৩৮]

এতদ্ সম্পর্কিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়,
"একদিন রসূলুল্লাহ স. এক স্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং খাদ্যে আর্দ্রতা অনুভব করলেন। অতঃপর বললেন, হে শস্যের মালিক! এমনটি কেন? মালিক বলল, বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৩৯]

এভাবে প্রতারণা করে কিংবা ধোঁকা দিয়ে পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা ভেজালের নামান্তর। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যের আসল রূপ গোপন রাখা হয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করার অপরাধ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

যখন কোন দু'ব্যক্তি স্বচ্ছতা ও সততার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করল, তখন তাদের এ বেচাকেনার মধ্যে কল্যাণ দান করা হয়। আর যদি তারা বিক্রীত বস্তুর দোষ-ত্রুটি গোপন করে এবং মিথ্যা কথা বলে তবে তাদের সে ক্রয়-বিক্রয়ের কল্যাণ (বরকত) উঠিয়ে নেয়া হয়।[৪০]

যারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাদ্য ও পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মেশায়, মিথ্যা তথ্য দিয়ে পণ্য বিক্রি করে, ওজনে কম দেয়, প্রতারণা করে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপী, জঘন্য অপরাধী, আর পার্থিব জীবনে তারা দেশ ও জাতির শত্রু। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাপাপী রূপে উত্থিত হবে। তবে সে সব ব্যবসায়ী নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সৎভাবে লেনদেন করবে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করবে।[৪১]

---

৩৮. আল-কুরআন, ২ : ০৯

৩৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আন-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস নং-২৯৪

৪০. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আস-সিদকু ফিল বায় ওয়াল বায়ান, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০, হাদীস নং-৩৯৩৭

৪১. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি স. ইয়্যাহুম, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা.বি,. খ. ৩, পৃ. ৫১৫, হাদীস নং-১২১০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (حسن صحيح) বলেছেন। হাকিম এটিকে সনদের দিক থেকে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। মুহাম্মাদ

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ-"নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ। তখন সাহাবা কিরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি?" রাসূলুল্লাহ স. জবাব দিলেন, بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ . "হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু তারা কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং শপথ করে গুনাহে লিপ্ত হয়।[৪২]

পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী আইন

মহান আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করে কল্যাণকর কাজ করতে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হল খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী। ইসলাম মানুষের জন্য পূত-পবিত্র, হালাল খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৪৩]

পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিঃসন্দেহে অপরাধ ও পাপের কাজ। এহেন কর্মকাণ্ড পরিহারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাকে তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।[৪৪],

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾

আমি কত জনপদকে ধ্বংস সাধন করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।[৪৫]

নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী সনদটিকে হাসান (حسن) বলেছেন; দ্র. *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-৯৯৪

৪২. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৫৫৬৯। হাদীসটি সহীহ। দ্র. *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৩৬৫, হাদীস নং: ৩৬৬

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

৪৪. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

৪৫. আল-কুরআন, ২১ : ১১

মানবসমাজে সৃষ্ট বা প্রচলিত অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি গুটিকয়েক লোক করে থাকে। আর এর ফলভোগ করে সমাজের সকলেই। তাই এহেন কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা সমাজের সকলেরই দায়িত্ব। পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল দেয়া একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। সমাজের মানুষ যদি তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করে তাহলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় দুস্কৃতিতে বাধা দিবে। যদি তা না কর, তবে অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করবেন। তারপর তোমরা তাঁকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।[৪৬]

বাংলাদেশে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মানসিকতা পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। কেননা মুনাফার অতিমাত্রায় লোভ তাদের অন্তরকে কলুষিত করে তুলেছে। তাদের অন্তঃকরণ ঈমানের আলোকে আলোকিত করে পূত-পবিত্র করা দরকার। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান! তোমাদের দেহের মধ্যে এক টুকরো মাংস রয়েছে। যখন তা বিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত দেহটাই বিশুদ্ধ হয়, আর যখন তা কলুষিত হয় তখন সমস্ত দেহটাই কলুষিত হয়। আর তা হচ্ছে অন্তঃকরণ।[৪৭]

পণ্যে ভেজাল দেয়া ধোঁকা বা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তাই যেসব লেনদেনে ধোঁকা বা প্রতারণা নিহিত রয়েছে রসূলুল্লাহ স. সেসব প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন, পাথরের টুকরো মিশিয়ে বস্তু বা পণ্য কেনা-বেচা করা।[৪৮] পণ্যে

---

৪৬. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮; হাদীস নং-২১৬৯। ইমাম তিরমিযী ও মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটিকে হাসান (حسن) বলেছেন। দ্র. *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২১৬৯

৪৭. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : আল-উকূফ ইনদাশ শুবহাত, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০৩, খ. ২, হাদীস নং-৩৯৮৪। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদীস নং-৩৯৮৪

৪৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : বুতলানু বায়ঈল হাসাতি ওয়াল বায় ফীহি গারার, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩, হাদীস নং-৩৮৮১

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

ভেজাল দিয়ে ধোঁকা বা প্রতারণার মাধ্যমে কেনা-বেচা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৪৯]

সমাজকে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ইসলাম পার্থিব শাস্তিকে যথেষ্ট মনে করেনি। তাই মানুষের মন-মানসিকতা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসমাজে ইসলামের উন্নত ও মহান চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সর্বাত্মক নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম মানুষের হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর প্রকৃত ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ।

উপরন্তু একজন সত্যিকারের মুসলিম জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, তিনি যা কিছুই করেন মহান আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। কারও কোন অপরাধ লোকজনের নিকট অজানা থাকলেও আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না। কেউ যদি অপরাধ করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবুও পারলৌকিক শাস্তি থেকে সে কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না। একজন মুসলিমের এহেন বিশ্বাস মানবসমাজে অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক।[৫০] কাজেই কোন মানুষ যদি ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে তার দ্বারা পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল দেয়া সম্ভব নয়।

পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে ভেজাল একটি বড় রকমের সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যার কবল থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও মুক্ত নয়। এ দেশে ভেজাল মেশানোর প্রবণতা অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অসৎ ব্যবসায়ী সর্বদাই স্বল্প পূঁজিতে এবং স্বল্প সময়ে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করতে চায়। এ কারণে তারা নীতি-নৈতিকতা মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করে না।

পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে পরিমাপে ও ওজনে কম দিয়ে, প্রতারণা করে, মজুদদারী করে, নিষিদ্ধ ও হারাম মিশিয়ে বিক্রি করে, অসাধু উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফা অর্জন করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের অধিকার, জনস্বার্থ, জনস্বাস্থ্য সর্বোপরি

---

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. মান গাশ্‌শানা ফালাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭; হাদীস নং-২৯৪

৫০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪, পৃ. ৩৯৬

মানুষের জীবন তাদের কাছে একেবারেই তুচ্ছ বিষয়। অথচ আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জন ব্যবসায়ী মুসলিম। তারা সালাত আদায় করেন, রোযা রাখেন, হজ্জ করেন। অনেকে যাকাতও দেন। যাদের মধ্যে এমন ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ বিরাজমান, তারা কিভাবে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মেশান? নিম্নমানের পণ্যকে 'এক নম্বর' বলে চালিয়ে দিয়ে প্রতারণা করেন? খাদ্য-পণ্যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল, বিস্ফোরক দ্রব্য, রং ও অরুচিকর উপাদান মেশান? বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক।

বাংলাদেশের হাট-বাজার, মার্কেট ও বিপণি বিতানগুলো ভেজাল পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা পরকালের মুক্তি ও সাফল্য লাভের চাইতে দুনিয়ার জীবনের সাফল্য ও ভোগ-বিলাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে তাদের ঈমানের ভিত্তি ও শক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। আর এ জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ইসলামী জ্ঞান চর্চা, গণসচেতনতা ও ইসলামের বিধি বিধানগুলোর প্রচারণা। সরকারি-বেসরকারি ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এহেন প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে করণীয়

উপর্যুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. সরকারের করণীয়

বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। জনস্বার্থ রক্ষার্থে সরকারকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের সদিচ্ছাটাই দেশের জনগণের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য বড় প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরী। বি.এস.টি.আই-এর কার্যক্রম শক্তিশালী করা ও সারা বছর বাজারে তাদের কার্যকর নজরদারি অব্যাহত রাখা। এ ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য সরকার দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত, খাদ্য ও পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার চরম ভয়াবহতার দিকগুলো জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভেজাল ও বিষমিশ্রণের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার মতো যথেষ্ট আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়

ভেজাল ও বিষমিশ্রণকে আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে ভোক্তা অধিকার আইন এবং সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ

অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিতকরণ যতদিন না আমাদের দেশে হবে, ততদিন পণ্যে ভেজাল চলতেই থাকবে। এ ছাড়া পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে সারা বছর এ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. ব্যবসায়ীদের করণীয়

বাংলাদেশে পণ্য ও খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আগ্রাসী, অতি দ্রুত মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক ধারার এবং ব্যবসায়িক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া অতি জরুরী। ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে সৎভাবে মুনাফা অর্জনের সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে।

৪. গণমাধ্যমের করণীয়

বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। পণ্য ও খাদ্যে ভেজালের ঘটনাগুলো গণমাধ্যম কর্মীরা বিভিন্ন মিডিয়াতে পরিবেশন করতে পারেন। পাশাপাশি মিডিয়াগুলোকে 'ফলো-আপ রিপোর্ট' করতে হবে। অর্থাৎ পণ্যে বা খাদ্যে ভেজাল ও বিষমিশ্রণসহ যে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লেগে থেকে লাগাতার সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। যেটি আমাদের মিডিয়া জগতের একটি বড় দুর্বলতা। সংঘটিত এ ধরনের অপরাধের ধারাবাহিক সংবাদ যদি পরিবেশন করা যেত, তাহলে দর্শক বা শ্রোতা সরকারের প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সবাই পুরো ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারতো। এতে একদিকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতো, অন্যদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের দায়িত্বশীল লোকজনের মধ্যে তৎপর থাকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হতো। এর ফলে নিশ্চয়ই একটি দীর্ঘমেয়াদী সুফল আমরা পেতাম।

৫. রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর করণীয়

বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতি সচেতন। এদেশে অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে, যারা তৃণমূল পর্যন্ত সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তাই রাজনৈতিক সংগঠনগুলো পণ্যে ভেজালের নানাবিধ ক্ষতিকর দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেন। ভেজাল মিশ্রণ বন্ধে জনগণকে সচেতন করে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন। সর্বোপরি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে দেশ শাসন করে। তাই পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা অত্যন্ত জরুরী এবং ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা মনে করি।

৬. সামাজিক সংগঠনগুলোর করণীয়

আমরাই প্রতিনিধিত্ব করছি সমাজের, এই দেশের। আমাদের দেশে অসংখ্য সামাজিক সংগঠন রয়েছে যারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে কাজ করে। আমাদের চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা দিয়ে সমাজকে ভেজাল ও দূষণমুক্ত করা আমাদেরই দায়িত্ব। তাই সামাজিকভাবে একজন ভেজাল মিশ্রণকারীকে চোর-ডাকাতের মতো হেয় করলে, তার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন না করলে, তাকে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে না ডাকলে তার পরিবর্তন হতে বাধ্য।

৭. জনসাধারণের করণীয়

জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমাদের ও আমাদের সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যত রক্ষার জন্য পণ্যে ভেজালকারবারীদের বিরুদ্ধে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি, তা অবশ্যই সফল হবে। তাই বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পর্যায় হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের করণীয় হলো-

১. খাদ্য এবং পণ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
২. পণ্যে ভেজাল রোধে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা;
৩. ভোক্তা অধিকার বা ক্রেতার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া;
৪. সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সক্রিয় ও নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;
৫. সাময়িকভাবে নয়; বরং সারা বছর ভেজালবিরোধী অভিযান সৎ ও দক্ষ লোকের (ম্যাজিস্ট্রেট) মাধ্যমে পরিচালনা করা;
৬. বি.এস.টি.আই- এর যথাযথ দায়িত্ব পালন এবং সর্বদা বাজার তদারকি করা;
৭. সকল ব্যবসায়ীকে সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা।

উপসংহার

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু অর্থোপার্জনের একটি মাধ্যম নয়, এটি মানবসেবার অন্যতম একটি মাধ্যম। এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলোর শরীআহসম্মত নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ইসলাম কীভাবে ক্রেতা বিক্রেতা এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করেছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্যসামগ্রীতে যেভাবে ভেজাল মিশিয়ে কেনা-বেচা করা হচ্ছে তা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের ব্যবসায় ইসলামে সর্বাবস্থায় হারাম। একজন মুমিন-মুসলিম ব্যবসায়ী এহেন হারাম ব্যবসা পরিত্যাগ করে হালাল ব্যবসা পরিচালনা করবেন, এটাই আমরা আশা করি। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা যদি সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন, ক্রেতাসাধারণ যদি সঠিক পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করেন, সর্বোপরি সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যদি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, তাহলে বাংলাদেশে পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও করণীয়

ড. আবু আইয়ুব মোঃ ইব্রাহীম*
শাহাদাৎ হুসাইন খান**

[সারসংক্ষেপ : *আমরা প্রতিনিয়ত শিশুদের চরম অবক্ষয়ের নানা ঘটনা জানতে পারি। অভিভাবকগণ শিশু সন্তানকে নিয়ে প্রায়শই দুশ্চিন্তায় ভোগেন। সন্তানদেরকে যেমন চেয়েছিলেন তেমন দেখতে না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হন। এটা আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আমরা কিভাবে শিশুদেরকে কাঙ্ক্ষিত মানে তৈরী করতে পারি? এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ সমস্যার সমাধান মানব মস্তিষ্কের অনুসন্ধানে হওয়ার নয়; এর সমাধান হতে পারে শুধু বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত বাণী আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স. উপস্থাপিত সুন্নাহ দ্বারা। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শিশুর চরিত্র গঠন ও বিকাশে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা অনুসন্ধান করেছি, তারপর করণীয় নির্ধারণ করেছি কীভাবে আমরা শিশু সন্তানদের গড়ে তুলতে পারি। শিশুদের সুন্দর চরিত্র বিনির্মাণে তিনটি পদক্ষেপ: ঈমান বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, যথার্থ জ্ঞান দান ও উন্নত চারিত্রিক শিক্ষা বিষয়ে পর্যালোচনা করেছি। আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রতিভাত হয়েছে যে, অভিভাবকগণ এই তিনটি মূল বিষয়কে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ইসলামের আলোকে শিশুদের চরিত্র গঠনের যথার্থ উদ্যোগ নিলে আশা করা যায়, তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। এভাবে যদি আমরা আমাদের প্রজন্মকে তৈরী করতে পারি, তাহলে আমাদের পরিবারগুলো জান্নাতী পরিবারে পরিণত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে হলেও একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে।]*

ভূমিকা

শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যত। শিশুদেরকে সত্যিকার ভালো মানুষে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা। শিশুর চারিত্রিক বিকাশে প্রয়োজন যথার্থ নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। এ জন্য শিশুর মধ্যে সুপ্ত অজস্র গুণাবলী ও যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটাতে হবে। কারণ এই বয়সটিই শিশুর ভাঙ্গা বা গড়ার সময়। শিশুদের চরিত্র বিকাশে আমরা যদি সর্বোচ্চ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারি; তাহলে শিশুরা হবে আমাদের জীবনের প্রশান্তি, পরিবারের জন্য অমূল্য সম্পদ এবং জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি।

---

* প্রভাষক, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার।

আমরা যদি এ বিষয়ে আগ্রহী হই, তবে আমাদেরকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তখন প্রশ্ন ওঠবে, আমরা কীভাবে শিশুর চারিত্রিক বিকাশ সাধন করতে পারি? এর উত্তরে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, ইসলাম এ ক্ষেত্রে কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিয়েছে। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে সে রূপরেখা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা'আল্লাহ।

শিশু পরিচিতি

শিশু বিষয়ক যে কোন গবেষণামূলক আলোচনার শুরুতে শিশুর পরিচয় একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বাংলা অভিধান অনুযায়ী অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাকে শিশু বলে।[১] শিশু শব্দের আরবী প্রতিশব্দ তিফ্‌ল (طفل)।[২] ইংরেজি অভিধানে যার অর্থ লেখা হয়েছে, Infant, baby, child.[৩] Oxford Dictionary তে child এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে, a young human who is not yet an adult.[৪] মূলত শিশুর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ১৪, ১৬, ১৮ বছরের নিচের সময়সীমার কোন ব্যক্তিকে বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৫]

একটি শিশু কত বছর পর্যন্ত শিশু থাকে, তার সময়সীমা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতি, সনদ ও আইনের যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) সহ আন্তর্জাতিক যে কোন নীতিমালা এবং সনদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখা হয়। তাই দেখা যায়, শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে দেশীয় আইনের সাথে কিছুটা বৈপরীত্য থাকে।

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর ১৯১টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত শিশু অধিকার সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই শিশুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, শূন্য (০) থেকে আঠারো (১৮) বছর বয়সসীমার মধ্যের সকল মানব সন্তানই শিশু। তবে শর্ত হলো, অন্য কোনো আইনের আওতায় যদি তাকে সাবালক ঘোষণা না করা হয়।

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একডেমী, ২০১১, পৃ. ১০৮২

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৬৬০

৩. J M. Cowan edited, *The HANS WEHR DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC*, New York : Spoken Language Services Inc, THIRD EDITION, 1976, p. 562.

৪. A. S. Hornby, *OXFORD Advanced Learners Dictionary*, Oxford, UK : Oxford University Press, 5th edition, 2005, p. 256.

৫. ELIZABETH A. MARTIN AND JONATHAN LAW edited, *A Dictionary of Law*, New York, USA : Oxford University Press Inc. 6th edition, 2006, p. 86.

সনদটির প্রথম পর্বের Article-১ (অনুচ্ছেদ-১) বলা হয়েছে :

> For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.[৬]
>
> এই সনদের উদ্দেশ্য পূরণে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো মানুষকে বোঝাবে, তবে শিশুর প্রতি প্রযোজ্য আইনে আরো কম বয়সেই শিশুকে সাবালক ধরা না হলে এ বিধান কার্যকর হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এ বলা হয়েছে, "শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে।"[৭] দেশের শিশু নীতিমালা ও বিভিন্ন আইনে শিশুর পরিচয় দানের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক।[৮]

এ সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের মতামতসমূহ বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব। বিখ্যাত আরবী অভিধান 'লিসানুল আরাব'-এ শিশু (তিফ্ল/طفل)-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

الصبى يدعى طفلا حين يسقط من بطن امه الى ان يحتلم

> মার্তৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ছেলে-মেয়েকে শিশু বলা হয়।[৯]

ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমর ইবনু আব্দুল আযীয রহ. পনের (১৫) বছরকে শিশুর বয়সসীমা উল্লেখ করেছেন।[১০] ইমাম সুফিয়ান আছ্-ছাওরী, ইবনুল মুবারক, আশ-শাফিয়ী, আহমাদ, ইসহাক রহ. এর মতে,

---

৬. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx, Access date : 27-01-2014

৭. *জাতীয় শিশুনীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ০৪

৮. বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ : ৯, সংখ্যা : ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৩, পৃ. ১২০-১২৪।

৯. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৫৬, খ. ১১, পৃ. ৪০২

১০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : বুলূগুস সিবইয়ান ওয়া শাহাদাতিহিম, বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., খ. ২, হাদীস নং-২৫২১; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু সিন্নুল বুলূগ, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.. খ. ৬, পৃ. ২৯, হাদীস নং-৪৯৪৪।
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَرَضَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

শিশুর বয়স পনের (১৫) বছর পূর্ণ হলেই সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। যদি পনের (১৫) বছরের পূর্বেই স্বপ্নদোষ হয়, তাহলেও সে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।[১১]

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে,

"পনের (১৫) বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক ও বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে অনধিক পনের বছর বয়স পর্যন্ত একজন বালক-বালিকা শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়।"[১২]

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি শিশুর মাঝে সাবালকত্ব বা বয়ঃসন্ধি ঘটলে ধরে নিতে হবে যে, তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে। তবে কারো মাঝে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ আদৌ পাওয়া না গেলে তার বয়স পনের বছর পূর্ণ হলে তাকে পূর্ণ মানব হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ সময় থেকে তাকে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলতে হবে।[১৩] উপর্যুক্ত পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, শিশুর সাবালকত্বের বয়স অর্থাৎ শিশুত্বের শেষ বয়সসীমা পনের। এ বয়সসীমা নির্ধারণের পিছনে বিভিন্ন যৌক্তিক কারণও রয়েছে।[১৪]

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা মানব সন্তানকে যথেষ্ট যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে তার যোগ্যতা দিয়ে সমাজ গড়তেও পারে, আবার ভাঙ্গতেও পারে। তাকে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও সুন্দর চরিত্রে উন্নীত করা যায়, তবে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। অন্যথায়

عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

১১. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হাদ্দি বুলুগির রজুলি ওয়াল মারআতি, বৈরূত : দারু ইহইয়াই তুরাছিল আরাবিয়্যি, খ. ৩, হাদীস নং-১৩৬১
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الِاحْتِلَامُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِي الْعَانَةَ

১২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, অনুবাদ : মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮৭

১৩. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

১৪. বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩২

সে হবে জাতির জন্য বোঝা নতুবা ক্ষতির কারণ। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিশুকে গড়ে তোলার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিভাবকের জন্য অত্যাবশ্যক। শিশুর চারিত্রিক বিকাশ, সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে পবিত্র কুরআন মাজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[১৫]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় কাতাদাহ ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেছেন :

قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم

তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে, আর তোমাদের পরিজনকে বাঁচাও তাদের সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে।[১৬]

তাফসীরে কুরতুবীতে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন,

فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير، وما لا يستغنى عنه من الأدب

আল্লাহ্‌র এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের সন্তানদের দীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভাল চরিত্র শিক্ষা দেব।[১৭]

আলী রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, علّموهم وأدّبوهم "তোমরা পরিবারবর্গকে শিখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং সে সব কাজে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোল।"[১৮]

সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী আর্দশ শিক্ষাদান ও ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় ও রাসূলে কারীম স. কে অনুসরণ করে চলার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা পিতা-মাতার বিশেষ কর্তব্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অতি বড় হক। সন্তানকে এই জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেয়ার চেয়ে অধিক মূল্যবান কোন দান হতে পারে না। যার বিনিময়ে পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই মর্যাদার অধিকারী হবেন।

---

১৫. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

১৬. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল আনসারী আল-কুরতুবী, *আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো : দারু কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭ খ্রি. / ১৩৮৭ হি., খ. ১৮, পৃ. ৮৫

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান*, বৈরুত : দারুল ফিকরি লিততবা'আহ ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৫ খ্রি. / ১৪১৫ হি., খ. ২৮, পৃ. ১৬০

শিশুর চারিত্রিক বিকাশে রাসূলুল্লাহ স. -এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ স. মানবজাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলামের স্বর্ণ যুগে বেড়ে ওঠা শিশুরা চারিত্রিক উৎকর্ষে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠান, কোন শিল্পকলা বা সভ্যতা-সংস্কৃতি এমন জ্ঞানে-গুণে, চরিত্রে শ্রেষ্ঠ শিশু উপহার দিতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ স. শিশুদের চারিত্রিক শিক্ষা প্রদানে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা দিয়ে পিতা-মাতা তাকে সুসজ্জিত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন :

ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن

"পিতা নিজের সন্তানকে যা কিছু প্রদান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।"[১৯]

সন্তানের ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদাকায়ে জারিয়াহ্ এবং আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধির কারণ। রাসূলুল্লাহ স. এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِى بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهَذَا

যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করল এবং তার উপর আমলও করল, তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। যার আলো সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী উত্তম হবে, যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা এ আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী তা বল।[২০]

বাংলাদেশের শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সমূহ

শিশুরাই একটি জাতির ভবিষ্যত। চরিত্রবান ও সুস্থ শিশু সুস্থ জাতি বির্নিমাণের পূর্ব শর্ত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের চারিত্রিক উন্নয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই দেখা যায়, সম্প্রতি

---

১৯. ইমাম আহমাদ, *আল মুসনাদ,* অধ্যায় : মুসনাদুল মাক্কীয়্যিন, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮০, হাদীস নং-১৪৮৫৬, ১৬১১১, ১৬১১৮; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফুল জামি আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,* বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, হাদীস নং-১২০০৮

২০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বিত্‌র, অনুচ্ছেদ : ফী ছাওয়াবি কিরাআতিল কুরআন, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ১, হাদীস নং-১৪৫৫; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ,* হাদীস নং-১৪৫৩

রাজধানীর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী ঐশীকে ইয়াবা সেবন ও অনৈতিক কাজে বাঁধা দিতে গিয়ে তারই হাতে খুন হতে হয়েছে তার পিতা-মাতাকে।[২১] শিশুদের মাদকাসক্তি, অবৈধ যৌনাচার পতিতাবৃত্তিসহ নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার হার মারাত্মক আকার ধারণ করছে। শিশুরা ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। আমরা প্রথমে শিশুদের এ নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ তথা চারিত্রিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান করব।

(ক) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন, জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন, প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান এবং প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।[২২]

ধর্ম ও নৈতিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নৈতিকতার মৌলিক উৎস হলো ধর্ম। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ও সমাজব্যবস্থায় ধর্মহীন নৈতিকতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যার ফলে শিশুরা একটি ধর্মহীন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিশুর চারিত্রিক বিকাশ ইতিবাচক পথে ও পদ্ধতিতে হতে পারে না। বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নৈতিক শিক্ষা নামে একাধিক কোর্স চালু করা হলেও তাতে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় উপাদান না থাকায় তা শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারছেনা।

(খ) পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাব

পরিবার হচ্ছে শিশুর শারীরিক ও চারিত্রিক বিকাশের কেন্দ্রভূমি। তা ছাড়া সমাজের একক হচ্ছে পরিবার। শিশুর চারিত্রিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার বিকল্প নেই। অপসংস্কৃতি ও মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে পড়ে বাংলাদেশের মুসলিমদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আজ হুমকির মুখে। যেখানে মুসলিম পরিবার ও সমাজের সর্বত্র ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা থাকার কথা ছিল সেখানে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে যথার্থ পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিশুর চারিত্রিক বিকাশ প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবারে ও সমাজে ধর্মের গুরুত্ব পূর্বের যে কোন

---

২১. *প্রথম আলো*, ১৮ আগস্ট, ২০১৩

২২. *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২০

সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং এর গতি ক্রমহ্রাসমান। একটি শিশু পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এখন আর পূর্বের মতো প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে তাদের যথাযথ চারিত্রিক বিকাশ হচ্ছে না।

(গ) মাদকতা ও অশ্লীলতার প্রসার

মাদকতা ও অশ্লীলতার প্রসার শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে অন্যতম অন্তরায়। দেশে অন্যান্য মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি ইয়াবা আসক্তির সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। একটানা মাত্র দুই-আড়াই বছর ইয়াবা সেবনের ফলে কিশোর-কিশোরীরা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের নার্ভগুলো সম্পূর্ণ বিকল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাদের অনেকেরই মস্তিস্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পথে।[২৩]

মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে অন্ধকার জীবনে চলে যাচ্ছে শিশুরা। এসব শিশুদের বেশির ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, যাদের বয়স ১০-১২ বছর। এরা মাদক সেবনের পাশা পাশি গাঁজা, ফেনসিডিল, চোলাই মদসহ বিভিন্ন প্রকারের মাদক বিক্রি ও সেবন করে আসছে।[২৪] আই এল ও (ILO) এবং ইউনিসেফ (UNISEF) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিশুরা পতিতাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য বহন ও বিক্রির মত মারাত্মক পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।[২৫]

২০০৮ সালে শিশু ধর্ষণ হয়েছে ১৪৪, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২০ জনকে।[২৬] Bangladesh Child Right Forum কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রদত্ত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পথশিশুদের ২৮.৭%-এর পিতা মাদকাসক্ত, ৫.১%-এর মাতা মাদকাসক্ত, ১৪.৯%-এর ভাই মাদকাসক্ত। একই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ৫০.২% পথশিশু মাদক ব্যবহারে অভ্যস্ত পরিবার থেকে।[২৭]

আরেকটি রিপোর্টে মাদকতার ভয়াবহ বিস্তৃতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

> At the beginning, the drug epidemic was confined in urban life. But now it is spreading towards the rural areas. The

---

২৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৪ আগস্ট, ২০১৩

২৪. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০১১

২৫. মাহমুদ জামাল, *শিশু অধিকার ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫৫-৫৬

২৬. *Monthly Compilation of Violence Reports, January 2008-16 December 2008* (based on 6 national newspapers), Bangladesh Shishu Adhiker Forum, Dhaka, accessed on 16 December 2008 at http://www.bsafchild.org/month.php.

২৭. *Annual Drug Report of Bangladesh, 2010*, Department of Narcotics Control, Ministry of Home Affairs,

young people are the main victims of drugs. But recently women and children are also largely being the victims of drugs. The most vulnerable group of population in Bangladesh for drugs are the street children, the slum dwellers, the marginalized women, sex workers, rickshaw pullers and hijra. Drug traffickers are largely deploying street children and marginalized women in trafficking of drugs.[২৮]

মাদকতা অশ্লীলতার উন্মেষ ঘটায়। এ দু'টো বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পবিত্র কুরআন এ দিকে ইঙ্গিত করেছে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?[২৯]

মাদকতা শুধু স্বাস্থ্যগত ক্ষতিই করে না; বরঞ্চ সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়। সামাজিক নানারকম অপরাধ ও অশ্লীলতা বিস্তারের জন্য এই মাদকতাই দায়ী। কারণ মাদকাসক্তির কারণেই ব্যভিচার, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের মত ঘটনা অহরহ ঘটছে। মাদকতা ও অশ্লীলতার অবাধ সুযোগ শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

(ঘ) তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্যে তথ্য, জ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু আশংকার কথা হলো, এর সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও অপরাধ সংঘটনের মাত্রা। শিশুদের চারিত্রিক অবক্ষয় সৃষ্টির জন্য রয়েছে নানা সাইট, নানা আয়োজন। গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ফেসবুক, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে শিশুদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, ভিডিও ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। সামাজিক নেটওয়ার্কের নামে ছেলে-মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক তৈরীর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই সর্বনাশা অপব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক অবনতি ঘটাচ্ছে।

---

২৮. *Annual Drug Report of Bangladesh, 2011*, Department of Narcotics Control, Ministry of Home Affairs, p. 08.

২৯. আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

(ঙ) এনজিওসমূহের নেতিবাচক কার্যক্রম

এনজিওসমূহের মধ্যে ব্র্যাক ৩৪,২৫০ টি প্রাইমারী স্কুল, ২৪,৭৫০ টি প্রাক প্রাইমারী স্কুল[৩০], বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৩১] এছাড়া প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেভ দ্যা চিল্ড্রেনসহ অন্যান্য এনজিওর শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা ঋণ, স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন, কিশোর উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি।[৩২] এ সব কার্যক্রম শিশুদের সেক্যুলার জ্ঞান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখলেও চারিত্রিক ও নৈতিকমান উন্নয়নে সহায়ক প্রমাণিত হয়নি। বরঞ্চ শিক্ষা দানের আড়ালে শিশুদেরকে ধর্মান্তরিত করা, গির্জায় যেতে বাধ্য করা,[৩৩] শিশু পাচার[৩৪] ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে কোন কোন এনজিওর বিরুদ্ধে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক এমন শিক্ষা শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে কখনোই সহায়ক হতে পারে না।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে করণীয়

শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধানের পর সেগুলো উত্তরণে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, এনজিও ও সরকারের কী ভূমিকা থাকা উচিত এ পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

পরিবারের করণীয়

পিতা-মাতার সব স্বপ্ন আবর্তিত হয় শিশু সন্তানের ভালো মন্দকে ঘিরে। সন্তানকে ভালো মানুষরূপে তৈরী করার জন্য পিতা-মাতার আগ্রহের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে পিতা-মাতা যথার্থ উদ্যোগ নিতে পারে না। যার ফলে পিতা-মাতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। শিশুদেরকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। এ প্রবন্ধে শিশুর চরিত্র গঠন ও বিকাশে যেসব করণীয় আলোচনা করা হয়েছে তা অনুসরণে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ শিশুর চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

---

৩০. *ব্র্যাক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮*, নয়াদিগন্ত, ২৮ জুন, প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫, পৃ. ১৩০-১৩১

৩৩. আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিওঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, ঢাকা : হক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

৩৪. মুহাম্মদ নুরুযযামান, *বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে*, ঢাকা : দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ১৯৯৬, পৃ. ৭৩

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশু প্রসব করে, তাতে তোমরা কানকাটা দেখ কি?

অতঃপর আবূ হুরায়রা রা. এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

আল্লাহ্‌র 'ফিতরাত' যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সরল সোজা মজবুত দীন।'[৩৫]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই আছে। যদি শিশুর পিতা-মাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং পরিবেশ যদি সুন্দর ও চরিত্র গঠনের অনুকূল থাকে তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতা-মাতা এ বিষয়ে যত্নবান না হয় কিংবা পরিবেশ যদি চরিত্র গঠনের অনুকূল না থাকে তবে শিশুর চরিত্র বিনষ্ট হয়। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কীভাবে পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের চরিত্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন তা এখানে আলোচনা করা হল।

১. ঈমান বৃদ্ধি ও দৃঢ় করার প্রশিক্ষণ

সন্তানদের ঈমান বৃদ্ধি ও দৃঢ় করার জন্য পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ প্রথমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কথা, তাঁর একত্বের কথা এবং তাঁর উপর ঈমান আনার কথা বলবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে এবং এসব কিছুর যে একজন স্রষ্টা রয়েছেন তাঁর কথা সন্তানদেরকে বুঝাবে। যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচিতি ও অস্তিত্ব তুলে ধরবে। সন্তানদের তাওহীদ শেখানোর জন্য অভিভাবকগণ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আ. এর পদ্ধতি অনুসরণ করবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . ﴾

---

৩৫. ইমাম বুখরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : ইযা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা ..., বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৫৬, হাদীস নং-১২৯৩

অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'এটাই আমার প্রতিপালক'। অতঃপর যখন সেটা অস্তমিত হলো তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না'। অতঃপর যখন সে চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক'। যখন এটাও অস্তমিত হল তখন বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব'। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমর প্রতিপালক', এটা সর্ববৃহৎ।[৩৬] যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। 'আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৩৭]

এছাড়া অভিভাবকগণ রব ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহ তাআলার পরিচিতি এবং আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিবে। আল্লাহর মহিয়ান নাম সমূহের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝাবে। শিরক, কুফর ও বিদ'আত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দিবে।

এ প্রসঙ্গে লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন, তা কুরআন মাজীদে এভাবে উল্লেখ রয়েছে :

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুল্‌ম।[৩৮]

এ নসীহতের অন্য অংশে তিনি বলেন,

﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[৩৯]

শিশুদের ৩ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত তাওহীদ, আল্লাহর পরিচিতি, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও মাহাত্ম্য এবং শিরক সম্পর্কে বয়স উপযোগী সুলিখিত বই পড়াতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ক দেশ বিদেশের ভিডিও, ডকুমেন্টারি, টিভি সিরিয়াল দেখার সুযোগ করে দিবে।

---

৩৬. এই সকল জ্যোতিষ্ক আল্লাহর সৃষ্ট ও তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এরা আল্লাহর আজ্ঞাবহ, এরা আল্লাহর শরীক হতে পারে না। ইবরাহীম আ. শিরক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপণ করেছিলেন।

৩৭. আল-কুরআন, ৬ : ৭৬-৭৯

৩৮. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

৩৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৬

এরপর পর্যায়ক্রমে তাদের কাছে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে রাসূলুল্লাহ স. এর মহৎ জীবনাদর্শ সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে হবে। যেভাবে তিনি যুগের নিকৃষ্ট মানুষগুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষে পরিণত করেছিলেন সে পদ্ধতি অনুসরণে তারা যেন নিজেদেরকে ও নিজেদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে পারেন সে চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। অন্যান্য নবীর জীবনী ও সাহাবীদের জীবনী পড়ার সুযোগ করে দিবেন। মা তার সন্তানকে কোলে থাকার সময় আল্লাহর নাম শিখাবেন। ৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতা সন্তানদেরকে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের গল্প বলবেন। ৬-১৮ বছর পর্যন্ত বয়সভিত্তিক কারিকুলাম করে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে শিশুদেরকে বিভূষিত করার প্রয়াস চালাবেন।

অভিভাবকগণ এরপর সন্তানদের সামনে ফেরেশতাদের পরিচয় তুলে ধরবেন। কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিবেন। কুরআনের ভাষা শিক্ষা দিবেন। কুরআনের আংশিক, সম্ভব হলে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করানোর উদ্যোগ নিবেন। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে কুরআনের আসরের আয়োজন করবেন। কুরআনের মর্মার্থ বুঝানোর চেষ্টা করবেন। কুরআনের শিক্ষা তাদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে হবেন। বিশেষত শিশুদের কুরআনের গল্প শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে হাদীসের শিক্ষা শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আখিরাতের প্রত্যেকটা পর্যায় কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়নের সুযোগ করে দিবেন। জান্নাতকে তাদের স্বপ্নে পরিণত করতে হবে। আখিরাত সম্পর্কে নিয়মিত অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২. ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান

ঈমান শেখানোর পর শিশুদেরকে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করতে হবে। এটা পিতা-মাতার উপর অবশ্য কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ স. জ্ঞানার্জনের শরয়ী গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।'[৪০]

---

৪০. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ঈমান ওয়া ফাযাইলিস সাহাবা ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল উলামা ওয়াল হাছ্ আলা তলাবিল ইলমি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৮১; হাদীস নং-২২৪। হাদীসটির উদ্ধৃত অংশটুকুর সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ*, হাদীস নং-২২৪

মা মিষ্টি ভাষায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। আদেশ-নিষেধ, কুরআন-হাদীসের নীতি বাক্য মুখে মুখে শেখাবেন। শিশুদেরকে ৩/৪ বছর থেকে সহজ ভাষায় ক্রমান্বয়ে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান শেখাবেন। শিশুদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। এই সুশৃংখল পৃথিবী ও দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টিকুশলতার পিছনে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনিবার্যতা তুলে ধরবেন। পবিত্র কুরআন এমন মননশীলতা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এর নিজস্ব ভঙ্গিতে :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দশনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।'[৪১]

পরিবারকে একটি বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে একটি পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের বয়স অনুপাতে কারিকুলাম দাঁড় করাতে হবে। কারিকুলামের মধ্যে বয়স অনুপাতে আকর্ষণীয় মলাট ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় কুরআন, হাদীস, নবী ও সাহাবীদের জীবনী, প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষামূলক বই থাকবে। শিশুদের জন্য নির্দোষ অথচ শিক্ষামূলক চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন সন্তানদের জন্য পিতা-মাতাকে নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। শিশুরা বড় হলেও তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। চরিত্র গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে দূর হতে পারে।

৩. উন্নত চারিত্রিক শিক্ষা

ঈমান ও ইলমের পরেই আসে চরিত্রের বিষয়। যদি শিশুদের ঈমান দৃঢ় হয়, যথার্থ ইলম ও উপলব্ধি অর্জন হয় তবে তাদের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন না হয়ে পারে না। মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকলে তার চরিত্র উন্নত হবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তদুপরি হাতে-কলমে চারিত্রিক শিক্ষা দেয়া ও তার নিয়মিত পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। শিশুদের চারিত্রিক গুণাবলী তৈরীতে পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। এর মধ্যে পরিবার শিশুর চারিত্রিক শিক্ষার

---

[৪১]. আল-কুরআন, ৩ : ১৯০-১৯১

শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণে শিশুদের পরিবার থেকে নৈতিক শিক্ষার সুযোগ দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

আমরা যদি শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে তৎপর হই, তাহলে পরিবারকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্তানদের জন্য তাদের হতে হবে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। পাশাপাশি তাদেরকে চরিত্র গঠনের জন্য উত্তম উপদেশ অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে লুকমান আ. সকল পিতা-মাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন, তা কুর'আন মজীদে এভাবে উল্লেখ রয়েছে :

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾

হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আপদ-বিপদে ধৈর্য্যধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ কর সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[৪২]

পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ব্যবহারিকভাবে ভাল কাজ শেখাবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা শিক্ষা দিবেন। শিশুদের হাত দ্বারা গরীব মিসকীনকে দান করার অভ্যাস করাবেন। অভুক্তদের খাবার দানের অভ্যাস করাবেন। ভালো সঙ্গ এবং ভালো পরিবেশে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, যুল্ম ইত্যাদি অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। পারস্পারক মেলা-মেশার আদব শেখাবেন। বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে নামাযের অভ্যাস করাবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামায আদায় করতে আদেশ করবে যখন তারা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে এবং নামাযের জন্য তাদেরকে শাসন

---

৪২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭-১৯

করবে, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছবে। আর তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।'[৪৩]

শিশুদেরকে অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখতে হবে। বিকল্প সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো কাজে উৎসাহিত ও খারাপ কাজে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতা যেমন প্রশিক্ষণ দেবেন, এর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আও করবেন। কারণ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন কাজে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা এভাবে দু'আ শিখিয়েছেন :

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানিয়ে দাও।'[৪৪]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয়

শিক্ষার আভিধানিক অর্থ পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষা অর্থ– শিক্ষাদান, প্রতিপালন, নির্দেশনা, সংস্কৃতি, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ, উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ চরিত্র গঠন। আল-কুরআনের ভাষায় :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾

তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি (রাসূল) তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করেন আর তাদেরকে আল-কুরআন ও হিকমাহ তথা সুন্নাহ শিক্ষা দেন; যদিও ইতঃপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক H. Horne লিখেন :

শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে খোদার সঙ্গে উন্নতভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি

---

[৪৩] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সলাম, অনুচ্ছেদ : মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সলাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং-৪৯৫। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৯৫

[৪৪] আল-কুরআন, ২৫ : ৭৪

[৪৫] আল-কুরআন, ৬২ : ২

> সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।[৪৬]

কবি মিল্টন শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন :

> Education is a continuous process through which mental physical and moral training is provided to new generation who also acquire their ideals and culture through it.
>
> শিক্ষা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের আদর্শ ও জীবনধারণের কলাকৌশল অর্জন করে থাকে।[৪৭]

শিক্ষার উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে শিশুদের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন উপযোগী সত্যিকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সে শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইসলামী দৃষ্টিকোণে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ সুশিক্ষায় বেড়ে ওঠা শিশুরাই পারে একটি নতুন সভ্যতা বিনির্মাণ করতে। পারে একটি কল্যাণমূখী সমাজ গড়তে। এ ক্ষেত্রে একটি চীনদেশীয় প্রবাদ স্মরণ করতে হয় :

> তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে শস্যদানা বপণ কর; যদি দশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে বৃক্ষরোপণ কর এবং যদি এক হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে মানুষ রোপণ কর।[৪৮]

সুশিক্ষার মাধ্যমে এ 'মানুষ সম্পদ' রোপণ করা হয় এবং সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ নৈতিক শিক্ষার অন্তরায়। এ পরিবেশে চারিত্রিক শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিশুদের চরিত্রে এর কোন নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। পরিবার থেকে অর্জিত মূল্যবোধের বিপরীত শিক্ষা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া হয়। ফলে তাদের বিশ্বাস ও কর্মে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হতে থাকে। গোটা শিক্ষা জীবনে তারা বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করতে থাকে।

---

৪৬. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৫

৪৭. *শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক ২০০৪*, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৩১৭

৪৮. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

সুতরাং শিশুদেরকে আদর্শ চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে চাইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস ও কর্মের এই বৈপরীত্য দূর করতে হবে। বিশ্বাসের আলোকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। চরিত্রবান শিশু তৈরীতে প্রয়োজন চরিত্র গঠন উপযোগী কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষিকার আদর্শ অনুকরণীয় জীবনাচরণ, চরিত্র গঠন উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ তৈরী। আর সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত ও পরিচালিত হবে উক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আশা করা যায় এমন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুরা শৈশবে ও কৈশোরে আদর্শ ও চরিত্রবান রূপে বেড়ে ওঠবে। শৈশবের দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তাকে আদর্শ মানুষে পরিণত করবে।

সমাজের করণীয়

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে সুসভ্য হয়ে চলাফেরা করে, তাই একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার শুরুতেই তাকে সঠিক পথে বিকশিত করার বা হবার সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য সমাজের করণীয় কিছু প্রস্তাবনা নিম্নে দেয়া হলো :

১. শিশুর চারিত্রিক বিকাশের সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন, আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;

২. সমাজের কেন্দ্র যেহেতু মসজিদ এবং মসজিদই সকল ভালোর উৎস, সেহেতু শিশুদের মসজিদমুখী করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। যেমন, শিশুদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিটি মসজিদে মক্তব ব্যবস্থা চালু করা;

৩. শিশুদের উপযোগী ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তাদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার (যেমন, ইসলামী বই) পুরস্কার প্রদান করা।

এনজিওসমূহের করণীয়

ইসলামী এনজিওসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: প্রি স্কুল সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, পথ শিশুদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান,[৪৯] আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, মডেল মাদ্রাসা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দান, বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প পরিচালনা,[৫০] ইয়াতীমদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং তাদেরকে

---

৪৯. *ঢাকা আহছানিয়া মিশন এ্যানুয়াল রিপোর্ট*, ২০০৮, পৃ. ৭

৫০. *জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, আগস্ট, ২০০৯, পৃ. ৭

লালন-পালন, উত্তম বাসস্থান, ল্যাবরেটরি সুবিধা, শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র, বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া।[৫১] রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সন্তান এবং অন্যান্য মুসলিমের সন্তানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সন্তানদের পবিত্র কুরআন ও দীনের জরুরী বিষয়সমূহ শিক্ষাদান ইত্যাদি।[৫২] ২৭৭ টি ইসলামী এনজিওর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি এনজিও উপরিউক্ত কর্মসূচী আংশিকভাবে পালন করে থাকে। যা বিপুল সংখ্যক শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের জন্য খুবই অপ্রতুল। উপরিউক্ত কর্মসূচীসহ সকল শিশুর সচ্চরিত্র গঠনে ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। ইয়াতীম, অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে উত্তম শিক্ষাদান ও ভবিষ্যত কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা খুব জরুরী। দরিদ্র শিশু পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি তাদেরকে দীনি চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের শিশুদের চরিত্র গঠনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

সরকারের করণীয়

সরকার জনগণের সেবক। জনগণের সেবা করার অন্যতম পদ্ধতি হলো, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের সার্বিক ব্যবস্থা করা। সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের চারিত্রিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

শিশুর চারিত্রিক বিকাশ যথাযথ পদ্ধতিতে না হলে এই শিশুরাই কিশোর অপরাধে ও বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন, সন্ত্রাস, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের চারিত্রিক বিকাশে যত রকম প্রতিবন্ধক হতে পারে তা দূর করতে সরকারকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের মেধা, মননশীলতা, সৃষ্টিশীলতা ও সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা পাঠক্রমে ইসলামী নৈতিকতার পাঠ প্রত্যেক শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

---

৫১. *BROCHURE*, Muslim Aid Bangladesh, p. 5.

৫২. মুহাম্মাদ আ. কাদের আফসারুদ্দীন, *আল হায়আতুল ইসলামিয়্যা আল খাইরিয়্যা ফি বাংলাদেশ দিরাসাতান ওয়া তাকভীম*, ২০০৬, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ২৮

উপসংহার

বিশ্বব্যাপী শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠা, 'শিশু দিবস', 'কন্যা শিশু দিবস' পালনসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু দুভার্গ্যজনকভাবে শিশুরা আজ তাদের মৌলিক অধিকার সুশিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। এমন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, যাতে সুস্থ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে বেড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। অভিভাবকদের অসচেতনতা ও অযোগ্যতার কারণে পরিবার থেকেও শিশুদের চারিত্রিক বিকাশের সুযোগ নেই বললেই চলে। যার ফলে শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের করুণ চিত্র আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমরা যদি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, তবে আমাদের পরিবার, পরিবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের প্রিয় সন্তানদের চারিত্রিক বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তারা যেন তাদের মন, মগজ ও চরিত্রকে ঈমান, জ্ঞান ও আমল দিয়ে সুসজ্জিত করতে পারে, সে ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি বলা যায়, শিশুদের চারিত্রিক বিকাশ সাধনে গোটা কর্মপদ্ধতি আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করলে এ ক্ষেত্রে যথার্থ সাফল্য পাওয়া যাবে। কারণ খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলাম প্রদত্ত শিশু নীতি বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ জাতি উপহার দিয়েছিল।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য : একটি পর্যালোচনা

অনুপমা আফরোজ*

[**সারসংক্ষেপ :** *নারী মহান আল্লাহ তাআলার এক অপূর্ব সৃষ্টি। মূলত আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তারা পার্থিব জীবনে একে অপরকে সহযোগিতা করবে- এটাই ইসলামের নির্দেশনা। তাই আল্লাহ তাআলা জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী জাতির অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও ইসলামে নারীদের অধিকার রয়েছে। তবে সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলির সর্বস্তরে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকায় নারীর সাক্ষ্য একক বা দ্বৈত হবে, না কি নারী-পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে নারী সাক্ষ্য দিতে পারবে, কোন্ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে পারবে না, সে সম্পর্কে মুসলিম ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে এবং প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে ধারাবাহিকভাবে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা, সাক্ষ্য প্রদানের গুরুত্ব ও সাক্ষীর যোগ্যতা, ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে নারীর সাক্ষ্য, নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিক্‌হবিদদের মতামত, শুধু নারীদের সাক্ষ্য, নারী-পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য, ফিক্‌হবিদদের মতামত পর্যালোচনা, আল-কুরআনে সাক্ষীর সংখ্যার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান থাকার কারণ, রাসূলুল্লাহ স. এর সময়ে নারীর সাক্ষ্য প্রদানের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।*]

আধুনিক জীবনধারায় ও আদালতে অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সাক্ষ্য আইন যুক্তিনির্ভর বলেই আইনশাস্ত্রের সকল স্তরে এর বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বিচারকার্যের ক্ষেত্রে সাধারণত পদ্ধতিগত আইন অনুসরণ করতে হয়। মূল আইনে বিচারপ্রার্থীর বিচার চাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং মুল আইনের আবরণে বিষয়গত প্রশ্ন সংযুক্ত থাকে এবং তার সত্যতা ও অসত্যতা উদঘাটনের জন্য পদ্ধতিগত আইনের সাহায্য নিতে হয়। পদ্ধতিগত আইনের আওতায় দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ব্যতীতও কতিপয় আইন রয়েছে, আর এসব আইনের বিধানকে বাস্ত বায়নের জন্য সাক্ষ্য আইন আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সেই কারণে সাক্ষ্য আইন পদ্ধতিগত আইন হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া মামলার পক্ষবৃন্দের বিরোধের গর্ভে নিহিত সত্য উদ্ধারকল্পে সাক্ষ্য আইনের বিধান প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিরোধ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নই বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

আর বিচার্য বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য পদ্ধতিগত আইন সাক্ষ্য আইনের উপর নির্ভরশীল হয়। তাই বলা যায়, ইসলামী ও প্রচলিত উভয় আইনেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে ইসলামী আইনের সর্ববিষয়ে বা সর্বক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যদানের সুযোগ, সাক্ষীর সংখ্যা, সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়বস্তু ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

সাক্ষ্যের সংজ্ঞা

প্রচলিত আইনে সাক্ষ্যের কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। সাক্ষ্য পরিভাষাটি মূলত আরবী আশ-শাহাদাহ (الشهادة) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। আশ-শাহাদাহ এর শাব্দিক অর্থ- সাক্ষ্য, সনদ, সার্টিফিকেট, প্রত্যয়নপত্র, উপস্থিতি, অকাট্য সংবাদ ইত্যাদি।[১] সাক্ষ্য শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত Evedens শব্দটি Evidens বা Eviders শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ-স্পষ্ট দেখা, স্পষ্ট দৃষ্টি, স্পষ্ট আবিষ্কার, নির্ধারণ করা, প্রমাণ করা ইত্যাদি।[২]

ইসলামী আইনের পরিভাষায় আশ-শাহাদাহ বা সাক্ষ্যের সংজ্ঞা হলো,

إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

> কোনো অধিকার প্রমাণের উদ্দেশ্যে আদালতে 'সাক্ষ্য' শব্দ দ্বারা যথার্থ সংবাদ পরিবেশন করা[৩]

ইসলামী শরীয়াতে সাক্ষ্যের সংজ্ঞায় আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী বলেছেন,

> الشهادة هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر فالإخبارات الثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار
>
> ইসলামী শরীআতে সাক্ষ্য বলতে বুঝায় একজনের ওপর অপর জনের কোনো অধিকার প্রমাণের নিমিত্ত বিচারকের সামনে সাক্ষ্য শব্দ দ্বারা ঘটনার যথার্থ বিবরণ তুলে ধরা। ঘটনার বিবরণ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক. একজনের ওপর অপরের কোনো অধিকার প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিবরণ। এ ধরনের বিবরণের নাম সাক্ষ্য (শাহাদাহ)। দুই. অপরের ওপর নিজের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিবরণ।

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫০২; সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৮, ২য় সংস্করণ, খ. ১, ভাগ-২, পৃ. ২৫৫

২. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *সাক্ষ্য আইন*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৪, পৃ. ৪

৩. ড. ওয়াহ্বাহ্ আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামিশক : দারুল ফিকর, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ২০৩

এ রূপ বিবরণের নাম দাবি (দা'ওয়া)। তিন. এর বিপরীত অর্থাৎ নিজের ওপর অপরের কোনো অধিকারের বিবরণ। এরূপ বিবরণের নাম স্বীকারোক্তি (ইকরার)।[৪]

মূলত সাক্ষ্যের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহগণ (ইসলামী আইনজ্ঞগণ) যদিও নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাক্ষ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন; তবুও এ সব সংজ্ঞার মর্মার্থ এক ও অভিন্ন।[৫]

মোটকথা বিচারকের বা বিচারক পর্যায়ের কারো সম্মুখে এবং বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে বা তাদের কোন পক্ষের উপস্থিতিতে তাদের একজনের উপর অপর জনের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোন অপরাধ প্রমাণের উদ্দেশ্যে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দযোগে সংবাদ প্রদান করাকে সাক্ষ্য বলে।

সাক্ষ্য মূলত দুই প্রকার। যথা : মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক সাক্ষ্য। আদালতে যে ঘটনার বিষয়ে বিচার বা তদন্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে সাক্ষীর যে সমস্ত বিবৃতি দেয়ার জন্য আদালত অনুমতি দেয় বা তার যে সমস্ত বিবৃতি আদালতের প্রয়োজন হয়, এই সমস্ত বিবৃতিকে বলা হয় মৌখিক সাক্ষ্য। আর যে সকল দলিল আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, এই সমস্ত দলিলকে বলা হয় দালিলিক সাক্ষ্য।[৬]

ইসলামে নারীর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। তাই ফকীহগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তাদের সাক্ষ্যের ওপর যতটা বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে ততটুকু যোগ্যতার স্বীকৃতিও তাঁরা দিয়েছেন। কারণ, সাক্ষ্যদান কোন খবর বা অবহিতকরণের নাম নয়। বরং সাক্ষ্যদান হলো কোন ঘটনাকে তার বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা এবং অবিকৃত রেখে ব্যাখ্যা করার নাম। এটা কোন সহজ কাজ নয়। বরং ব্যক্তির নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া একটা বিরাট দায়িত্ব। এটা এত বড় একটা দায়িত্ব যে, বিচারক তার ওপর নির্ভর করে বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য।[৭]

---

৪. আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলী আল-জুরজানী, *আত-তারীফাত*, তাহকীক : ইবরাহীম আল-আম্বারী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৫ হি., পৃ. ১৭০, ভুক্তি নং-৮৪১

৫. *আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, কুয়েত : অযারাতুল আওকফি ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাই, ১৪০৪-১৪২৭ হি., খ. ২৬, পৃ. ২১৬

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء .

وعرفها الدردير من المالكية : بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه .

وعرفها الجمل من الشافعية بأنها : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد .

وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت

৬. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *সাক্ষ্য আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৮১

প্রচলিত আইনে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য, যদি আদালত মনে না করেন যে, তারা অল্প বয়স, অতি বৃদ্ধ বয়স, দৈহিক বা মানসিক ব্যাধি বা অনুরূপ কোন কারণে তাদেরকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে বা সেই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে তারা অক্ষম।[৮] প্রচলিত আইনে বর্তমান ধারার সাক্ষ্য আইনে বলা হয়েছে, যিনি সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য তিনিই সাক্ষ্য দিতে পারেন। সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা কথাটির মর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ ব্যতীতও শিকারী কুকুর বা অন্য কোন পশু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তদন্তকার্যে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও বিচারাদালতে সাক্ষী হিসেবে শপথপূর্বক সাক্ষ্য দিতে পারে না। আবার মানুষ হিসেবে বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর না দিতে পারলে আদালত তার সাক্ষ্য গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করতে পারেন।[৯]

সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী অপরিণত বয়স, অত্যধিক বার্ধক্য, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা বা এই ধরনের অন্য কোন কারণ বিদ্যমান থাকলে তাকে সাক্ষী হিসেবে অযোগ্য গণ্য করা হয়। তবে কোন অসুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে এবং তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তবে তাকেও উপযুক্ত সাক্ষী বলা যায়। অসুস্থ ব্যক্তি সাময়িক সুস্থতার সময় সাক্ষ্য দিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং আইনের দৃষ্টিতে মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও জবানবন্দি করানো যায়। আদালতের কাঠগড়ায় উঠে সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতা না থাকলেও কমিশনে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়।[১০]

একই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আদালতের মতে, ১. তারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে অক্ষম; ২. জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম বলে গণ্য হয়। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে অক্ষমতার কারণ হচ্ছে, ক. অত্যধিক বার্ধক্য; খ. শারীরিক অথবা মানসিক অসুস্থতা; গ. এরূপ অন্য কোন কারণ। সাক্ষ্য দেয়ার প্রশ্নে সাক্ষীর যোগ্যতা নির্ধারণের একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে সাক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে এবং এর যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম কি না তা দেখা। অতিবৃদ্ধ, শিশু বা অস্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে এবং যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১১]

---

৮. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *সাক্ষ্য আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৩৬২

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

সুতরাং ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনে সাক্ষ্যের গুরুত্ব ও সাক্ষীর যোগ্যতা, সাক্ষীর সংখ্যা, সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যে নীতিমালা রয়েছে তার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ইসলামী আইনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে বলেই বিচারব্যবস্থা দিন দিন জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সাক্ষীরাও বিভিন্ন প্রকার বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে এবং সাক্ষ্য প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছে। এর ফলে প্রকৃত সাক্ষীর অভাবে ন্যায়বিচার ব্যাহত হচ্ছে। অতএব, এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজে ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করতে ইসলামী সাক্ষ্যবিধি প্রবর্তন করা একান্ত জরুরী।

ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য

ইসলামে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের প্রায় সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমতা থাকলেও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাক্ষীর সংখ্যার হিসেবে তাদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। তবে মানবতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম নর-নারীতে যে সাম্যের সৃষ্টি করেছে, তার সাথে এই ব্যবধানের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামে এই ব্যবধান রয়েছে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদে। নিম্নে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হবিদদের মতামতের ভিত্তিতে ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত আলোচনা বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো।

আল-কুরআনের আলোকে

পবিত্র কুরআনে যে কয়টি স্থানে সাক্ষ্যদানের বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে একটি স্থানে নারীর সাক্ষ্যদানের অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন,

﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾

> তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখ, সে সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১২]

এ আয়াতে সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রে দু'জন মহিলার কথা বলা হয়েছে, কারণ মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নারী সৃষ্টিগতভাবে লাভ করেছে।[১৩] তাছাড়া ইসলাম যদিও নারীদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে

---

১২. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

১৩. আল্লাহ্ প্রদত্ত আবেগপ্রবণতাই নারীদের পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অপূর্ণ চেতনার প্রতি ধাবিত করে। মানুষের পাওনা বা অধিকার এমন জিনিস, যার ব্যাপারে সাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা আবশ্যক

অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করেছে, তথাপি তার ওপর যে বিশেষ সামাজিক দায়িত্বটি অর্পণ করেছে তা হলো পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বটি তাকে বেশিরভাগ সময় নিজের বাড়ির অভ্যন্তরে অবস্থান করতে বাধ্য করে।[১৪]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾

"সাক্ষীগণকে তলব করা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে।"[১৫]

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾

"...এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদান করবে ।[১৬]

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা করে তার অন্তর অপরাধী।"[১৭]

এবং সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী। অনেক সময় নারীরা আদালত কর্তৃপক্ষের সামনে জবানবন্দীতে যা বলা প্রয়োজন তা অনেকাংশ ভুলে যায়। তাই ইসলামী আইনে আদালতী কার্যক্রমে ক্ষেত্র বিশেষে নারীর সাক্ষ্য, পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। কিন্তু নারী সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্যই রায়ের পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যথা- দুধপান করা। এ কারণেই আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। মুহাম্মদ সায়্যিদ আস-সাফতী, *মুসলিম নারী প্রসঙ্গ*, ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, ১ম সংস্করণ, পৃ.৭৪; মুসতফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২২

১৪. পারিবারিক প্রয়োজনে সাধারণত নারীকে অধিকাংশ সময় ঘরের অভ্যন্তরে থাকতে হয়। তাই লেনদেনের সময় নারীর উপস্থিতি খুব একটা চোখে পড়ে না। তাই অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যদানও খুব বিরল ঘটনা হয়ে থাকে। কারণ লেনদেনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যদি বা কখনো নারী পায় তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ওটাকে স্মরণ রাখতে আগ্রহী হয় না বা এটা তার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়। তাই ঐ ঘটনার সাক্ষ্য দিতে সে যখন বিচারকের সামনে দাঁড়াবে, তখন সে খানিকটা ভুলেও যেতে পারে। আর দুইজন মহিলা একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে একজন ভুলে গেলেও অপরজনের ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। -মুসতফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৫. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

১৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ২

১৭. আল-কুরআন, ২ : ২৮৩

আল-হাদীসের আলোকে

হাদীসে নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. একসময় নারীদের বলেছিলেন,

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? (নারীরা) সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা তার (নারীর) জ্ঞান-বুদ্ধির অপূর্ণতার কারণেই।[১৮]

উকবা ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি এক মহিলাকে বিবাহ করি। এ সময় একটি কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোক এসে বললো, আমি তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছি। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি অমুক নারীকে বিবাহ করেছি। এরপর এক কৃষ্ণকায় মহিলা এসে বলছে যে, সে আমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছে। অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এই কথায় রাসূলুল্লাহ স. আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি আবার তাঁর সামনে গিয়ে পুনরায় বললাম, ঐ নারী মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেন,
>
> كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ
>
> কীভাবে সে মিথ্যাবাদিনী হতে পারে, অথচ সে দাবি করছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছে। অতএব তুমি তাকে ত্যাগ কর।[১৯]

অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ স. মৃত্যুদণ্ড দান করেছেন। বর্ণিত আছে,

> এক ইহুদী দুই পাথরের মধ্যখানে এক যুবতীর মাথা রেখে তাকে নির্মমভাবে আহত করে তার গলার হার ছিনিয়ে নেয়। তাকে রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আহত করেছে? সে মাথার ইশারায় বলে, না। তিনি বলেন, তবে অমুক ব্যক্তি কি? সে মাথার ইশারায় বলে, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ইহুদী কি তোমাকে আহত করেছে? সে বলে, হ্যাঁ। অতঃপর, তাকে রাসূলুল্লাহ স. ধরে আনার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তার মাথাটি দুটি পাথরের মধ্যে রেখে ফাটিয়ে দিলেন।[২০]

---

১৮. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হায়য, অনুচ্ছেদ : তারকুল হায়িযিস সওম, বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ খ্রি., খ. ১, হাদীস নং-২৯৮

১৯. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতুল মুরযিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং-৪৮১৬

২০. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, অনুচ্ছেদ : আল-ইশারাতু ফিত-তালাকি ওয়াল উমুর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং-৪৯৮৯

অন্য একটি হাদীসে আছে-

> রাসূলুল্লাহ স. এর জীবদ্দশায় এক মহিলা মসজিদে নববীতে ফজরের নামায পড়তে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক ব্যক্তি জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। তার চিৎকারে লোকজন এসে অপরাধীকে ধরে ফেলে। তাকে মহানবী স. এর নিকট উপস্থিত করা হলে উক্ত মহিলা তাকে সনাক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ স. অপরাধীকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নির্দেশ দেন।[২১]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, একজন মাত্র নারী কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার এবং অপরাধীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ স. মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোরতম শাস্তি কার্যকর করেছেন। সুতরাং হদ্দ সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ, স্থান ও আদালতের সংগৃহীত তথ্য প্রমাণের সাথে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার প্রদত্ত জবানবন্দীর সামঞ্জস্য থাকলে এই অবস্থায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কে ফিক্‌হবিদদের মতামত

মুসলিম ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিতে নারীর সাক্ষ্য নিম্নরূপ হবে :

- হদ্দ[২২] ও কিসাস[২৩] এর ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
- হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যগ্রহণযোগ্য।
- বংশ প্রমাণ, দুধপান সম্পর্কিত বিষয় প্রমাণ এবং নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।[২৪]

নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত সঠিক বিষয়টি উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'শুধু নারীর সাক্ষ্য' ও 'নারী পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য'কে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হলো :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

২১. ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭, খ. ২, হাদীস নং-১৪৫৪

২২. হদ্দ হলো এমন এক প্রকার শাস্তি যা পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন, ব্যভিচারের শাস্তি, চুরির শাস্তি, মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি ইত্যাদি।

২৩. কিসাস হলো হত্যা মামলায় জীবনের বিনিময়ে জীবন গ্রহণ করা।

২৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, ভাগ-২, পৃ. ১৮

শুধু নারীর সাক্ষ্য

নারীর সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি দুইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তা হলো- একক নারীর সাক্ষ্য ও দ্বৈত বা কয়েকজন নারীর সাক্ষ্য। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখিত হলো :

শুধু নারীদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বহুসংখ্যক ফিক্‌হশাস্ত্রবিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আদৌ গ্রহণ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, যেসব ক্ষেত্রে অপরাধ হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত সেইসব ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আলী রা. বলেন,

لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء

হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বিধেয় নয়।"[২৫] 'উমার রা. থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।[২৬]

ইমাম যুহরী রহ. বলেন,

مَضَت السُّنَّةُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

রাসূলুল্লাহ স. ও পরবর্তী দুই খলীফার যুগ হতে এই নীতি চলে এসেছে যে, হদ্দ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বিধেয় নয়।[২৭]

হাসান আল-বাসরী, শা'বী, যাহহাক, ইব্রাহীম আন-নাখ'য়ী প্রমুখ তাবি'ঈ রা. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। তবে হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অপরাধ কোন কারণে তাযীর এর আওতাভূক্ত হলে সে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন- চুরির ক্ষেত্রে অপরাধ হদ্দের পর্যায়ভুক্ত না হলে সে অবস্থায় নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিতই হোক অথবা আর্থিক বিষয় বহির্ভূতই হোক পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন বিবাহ, তালাক, ওয়াকালা, ওসিয়াত, হাওয়ালা, ওয়াকফ, সন্ধি, হিবা, স্বীকারোক্তি, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।[২৮]

---

২৫. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : হাল তাজূযু শাহাদাতুন নিসা..., হা.নং- ১৫৪০৫

২৬. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : হাল তাজূযু শাহাদাতুন নিসা..., হা.নং- ১৫৪০৭

২৭. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতুন নিসা ফিল হুদূদ, হা.নং: ২৯৩০৭; কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'ই*, খ. ৬, পৃ. ২৭৯

২৮. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ২৩২-২৩৩

নারীদের একান্ত গোপনীয় বিষয়ে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য, এমনকি একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন, কোন নারী 'বাকিরা' কুমারী কি না, কোন নারীর হায়েযকাল শেষ হয়েছে কি না, সন্তান কার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে, সন্তান জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি না, যদি হয়ে থাকে তবে শব্দ করেছে কি না, কোন নারীর মধ্যে বিশেষ কোন দৈহিক ত্রুটি আছে কি না ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৈধ। ইমাম কুদূরী রহ. বলেন, "প্রসবের ক্ষেত্রে, কুমারিত্বের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের যে সকল স্থানের দোষ পুরুষেরা জানতে পারে না, সে সকল দোষের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[২৯]

সন্তানের বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ হলে সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ধাত্রী বা মহিলা চিকিৎসকের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধাত্রী বা মহিলা চিকিৎসকের একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সন্তান তার আত্মীয়-স্বজনের মীরাস লাভ করবে।[৩০]

কোন নারীর স্বামী নপুংসক হলে সেক্ষেত্রে তার স্ত্রী বালিগা কি না সে বিষয়েও একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যদি সে বালিগা হয় তবে স্বামীকে এক বৎসরের চিকিৎসার সুযোগ প্রদানের পরও সে সহবাসে সক্ষম না হলে আদালত স্ত্রীর দাবি অনুযায়ী বিবাহ বাতিল করবে।[৩১]

মুসলিম উম্মাহর প্রায় সমস্ত ফিক্‌হবিদই একমত যে, মেয়েদের যে সব ব্যাপারে পুরুষদের জানার সুযোগ নেই শুধু সে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট। যথা, দুধপান করানো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।[৩২]

ইমাম শাফি'য়ী রহ. বলেন, সন্তান প্রসব এবং মেয়েদের (গোপনীয় অঙ্গসমূহের) দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যে সব (জ্ঞানী ও বিদ্বান) লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি তাঁদের কাউকেই এ মতামতের বিরোধী পাইনি।[৩৩]

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, যে সব ব্যাপারে নারী ছাড়া আর কেউ অবহিত হতে পারে না সে সব ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট ও বিধিসম্মত। এটা একটা স্বীকৃত রীতি-প্রথা হিসেবে চলে আসছে।[৩৪]

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*, (অনূদিত), ঢাকা : তাজ কোম্পানী, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৪৬৫

৩১. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৩২. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতুল মুরযিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং-৪৮১৬। মুল হাদীসটি জন্য ১৯ নং ফুটনোট সংশ্লিষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্য

৩৩. ইমাম শাফেয়ী, *কিতাবুল উম্ম*, মিশর : দারু সাদির, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৭৯

৩৪. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

বিশেষ বিশেষ মেয়েলী বিষয় ছাড়া জীবনের অন্য সব বিষয়ে শুধু মেয়েদের সাক্ষ্য হানাফী ফকীহগণ, ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ী রহ. এবং তাঁদের মতের সমর্থক আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ গ্রহণ করেননি।[৩৫] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এবং আতা ইবনে আবী রাবাহ্ রহ.ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নারীদের সাক্ষ্য কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই জায়িয, যে সব বিষয়ে তারা ছাড়া আর কেউ অবহিত হতে পারে না। অর্থাৎ নারীদের গোপনীয় অঙ্গসমূহ, গর্ভ এবং হায়েয সম্পর্কে তাদের বক্তব্য অনুসারে ফয়সালা করা হবে। এজন্য পুরুষের অংশগ্রহণ জরুরী নয়।[৩৬] আলী রা. ও ওমর রা. এই বিষয়ে একই মত পোষণ করতেন, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের কতিপয় ক্ষেত্রে এর ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তারা সর্বক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যকে সমর্থন না করলেও কতিপয় ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকার্যের ফয়সালা দান করেছেন।[৩৭]

নারীদের একান্ত গোপনীয় বিষয়ে কেবল তাদের সাক্ষ্য যে কারণে গৃহীত হয় অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রের জ্ঞান কেবল নারীদেরই থাকা সম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে কেবল নারীদের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা উচিত বলে কিছু সংখ্যক ফিক্‌হবিদ মত প্রকাশ করেন। আলী রা. ও উমর রা. থেকে পরস্পর বিরোধী যে মত পাওয়া যায় ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মতটি দ্বারা তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। যেমন, তাঁদের মতে, শুধু নারীদের সাক্ষ্য তাঁরা এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভের সুযোগ নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি থাকে। আর মেয়েদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শুধু ফয়সালা করেছেন যখন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করলে অধিকার নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল।[৩৮]

---

৩৫. ইবনে হাযম, *আল মুহাল্লা*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা. বি, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫-৪০০

৩৬. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৩৭. যেমন হিন্দ বিনতে আবী তালহা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একস্থানে আমরা কয়েকজন মহিলা সমবেত হয়েছিলাম। সেখানে চলার পথে এক মহিলা কাপড়ে আবৃত একটি শিশুকে পদদলিত করলে শিশুটির মা দাবি করলো, সে আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে দশজন মহিলা আলীর রা. সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আলী রা. হন্তা মহিলার ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক করে দিলেন। (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং- ২৮৬১০) উমর রা. সম্পর্কে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি বিয়ে, তালাক, শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি এবং হত্যার ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য সঠিক বলে মনে করতেন না। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এক সময় চার জন মহিলা এসে উমর রা. এর সামনে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উমর রা. স্বামী ও স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন। (ইবনু হায্‌ম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৯, পৃ. ১৫১)

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "মেয়েরা যদি বিয়ের মজলিসে বা হাম্মামখানায় সমবেত হয় এবং সেখানে হদ্দের উপযুক্ত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে সে পরিস্থিতিতে হদ্দের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।" বকর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতার বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ রহ. থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৯]

ইবনে সাদাকা রহ. একটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের অছিয়ত করে এবং ক্রীতদাসকে আযাদ করে আর নারী বা কোন পুরুষ সে সময় উপস্থিত না থাকে, তাহলে এ ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে কি নারীর সাক্ষ্য জায়িয হবে? ইমাম আহমদ বললেন, হ্যাঁ অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য জায়িয। একইভাবে তালাকের রুজু করার ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কারণ, নথিপত্র লেখার সময় তার উপস্থিত থাকা যত সহজ, তালাক রুজু করার ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা তার চেয়ে বেশি সহজ। অর্থাৎ পূর্ব বর্ণিত অবস্থায় যদি তার সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী অবস্থায়ও গৃহীত হওয়া উচিত।"[৪০]

ইমাম ইবন হায্‌ম রহ. এর মতে, যিনা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম সাক্ষী হতে হবে অথবা প্রতি জন পুরুষের পরিবর্তে দুই জন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হতে হবে। হদ্দ, কিসাস, অনুরূপভাবে বিবাহ, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ফিরিয়ে আনা, ধন-সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বা এককভাবে চারজন মহিলার সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকতে হবে।[৪১]

আতা ইবনে আবী রাবাহ্ রহ. বলেন, যদি আট জন মহিলা কারো ব্যাভিচারী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আমি তাকে পাথর মেরে শাস্তি দেবো। ইমাম ইবনে হাযম রহ. দুইজন মহিলাকে একজন পুরুষের সমকক্ষ স্বীকার করে নিয়ে সর্বাবস্থায় এবং সব রকমের অধিকারের ক্ষেত্রে ও বিষয়ে তাদের নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কাজী শুরাইহ্ রহ. এর মতও অনেকটা এরূপ। এক পরিবারের আসবাবপত্র সম্পর্কে তার কাছে একটি মামলা আসে। বাদী ও বিবাদী উভয়ে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। স্বামী দাবি করছিল যে, সম্পদ ও আসবাবপত্র তার। কিন্তু চারজন মহিলা সাক্ষ্য দিল যে, এসব আসবাবপত্র স্ত্রীর। স্বামী স্ত্রীকে তার মাহ্‌রের টাকার বিনিময়ে এ সব আসবাবপত্র দিয়েছে। মহিলাদের সবার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজী শুরাইহ রহ. স্বামীর বিরুদ্ধে মামলার রায় দিলেন। এ ধরনের আরো একটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মাহ্‌র সংক্রান্ত একটি মামলায় চারজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

---

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৪১. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৮২

ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া রা. তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। মু'আবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র উম্মে সালামার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি একটি বাড়ি সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা করেছিলেন।[৪২] সুতরাং বলা যায়, ইসলামী আইনে ক্ষেত্র বিশেষে শুধু নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য

যে সব ফকীহ্ সর্বক্ষেত্রে এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ না করার জন্য তাদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়, তারা তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। যে সব ফকীহ্ মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সমস্যার সীমিত গণ্ডির মধ্যেই কেবল এককভাবে নারীদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় তাদের ব্যাপারে। মেয়েদের সীমিত গণ্ডির বাইরে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নারীর সাথে পুরুষ শরীক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে প্রস্তুত নন। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না- এ বিষয়ে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

রাবী'য়া রহ. এর মতে বিয়ে, তালাক, হৃদ্দ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) এবং দাস মুক্তির ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যেসব লেনদেন এবং অধিকার নির্ধারিত হয় সে সব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।[৪৩]

ইমাম শাফি'য়ী রহ. বলেন, শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ বক্তব্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করা যেতে পারে। যদিও আর্থিক ক্ষেত্র কী- তা নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে অল্প মতভেদ রয়েছে। সমস্ত হানাফী ফকীহ্ এবং উসমান বাত্তী রহ. শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি এবং কিসাস ছাড়া আর সব ব্যাপারে নারী ও পুরুষের যৌথ ও সম্মিলিত বক্তব্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে মেনে নেন। ইমাম সুফ্ইয়ান আছ-ছাওরী রহ.ও এই মত পোষণ করতেন বলে একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর কাছে কিসাসের ক্ষেত্রেও যৌথ সাক্ষ্য জায়িয। শুধু 'হুদুদ' বা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট মনে করেন না। তাউস রহ. বলেন, শুধু ব্যভিচার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না এ কারণে যে, এ দৃশ্য দেখা নারীদের জায়িয নয়। আতা ইবনে আবী রাবাহ্ রহ. এর মতে, ব্যভিচার এবং অন্য আর সব ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ব্যভিচারের ব্যাপারেও যদি তিনজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। এ মতের সাথে ইমাম মালিক রহ.ও একমত পোষণ করেন।[৪৪]

---

৪২. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ মহিলা সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতার দিক দিয়ে পুরুষের মতই গণ্য। তবে যদি তার ব্যাপারে কোন ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকে তাহলে তার সমান আরেকজন মহিলার সাহায্যে তার সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করা হয়। দুইজন মহিলাযোগে সাক্ষ্যকে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রদত্ত সাক্ষ্যকে কখনও কখনও এক বা একাধিক পুরুষ প্রদত্ত সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী করে দেয়।[৪৫]

সুতরাং আদালতে ন্যায়পরায়ণতার সংরক্ষণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক গ্রহণ করাতে ইসলামী আদালতের কার্যপ্রণালী সমালোচিত হতে পারে না। বিশেষ করে ইসলামী আদালত এ বিষয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। যাতে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।[৪৬] তাছাড়া মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামী আদালত কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর একক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা প্রদান করে থাকে।

নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিক্হবিদদের মতামত পর্যালোচনা

নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে ফিক্হবিদদের যে মতামত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত রায় কোন্‌টি- নিম্নে কুরআন-হাদীস ও বুদ্ধি-বিবেচনার নিরিখে তা জানার প্রচেষ্টা চালান হবে।

ইমাম মালিক রহ. ও শাফি'য়ী রহ. সহ ফিক্হবিদদের যে দলটি শুধু অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য জায়িয মনে করেন, তাঁদের মতামত এই ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারীর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বিবেক মূলত এমন নয়, যাতে কোন ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। তবে যেহেতু কোন কোন পরিস্থিতিতে তার জ্ঞান বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না, তাই বাধ্য হয়েই তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা ও মীমাংসা করতে হয়। তাই প্রয়োজনের কারণেই নারীর সাক্ষ্য দান জায়িয হয়েছে।[৪৭]

এ কথার ভিত্তি দুটি। একদিকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় ব্যভিচার, তালাক এবং তালাক থেকে রুজু করার বিষয়, অসিয়ত এবং ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের কথা

---

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৮৯

৪৬. ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণের মূল নীতিমালা যিনি প্রণয়ন করেছেন, তিনিই তো নারী পুরুষ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত। এ বিষয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত। - আল-কুরআন, ৬৭ : ১৪

৪৭. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

বলতে গিয়ে সাক্ষ্যদানের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে নারীর বিষয়টি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআনে নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত বিধান যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তাও এর ভিত্তি। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾

তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে। এমন লোকদের মধ্যে থেকে এসব সাক্ষী হবে যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। (একজন পুরুষের স্থানে দুইজন নারী এজন্য যে) তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তা স্মরণ করিয়ে দেবে।[৪৮]

এ দু'টি কথা দ্বারা এসব মনীষী বুঝেছেন যে, ঋণ অথবা এ ধরনের অন্য সব ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ নয় এবং ঋণ বা এ ধরনের মাসয়ালার ক্ষেত্রেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার কারণ হলো, প্রতি পদে পদে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ ছাড়াও সব সময় কেবল পুরুষকেই সাক্ষী হিসেবে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া আয়াতটির শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে তারা এই সুত্রটিও রচনা করেছেন যে, নারীর সাক্ষ্য কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তার সাথে পুরুষও সাক্ষী হিসেবে থাকবে। কারণ, নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজনের তাগিদে জায়িয করা হয়েছে। তাই যেভাবে এবং যতটা অনুমতি দেয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, "মেয়েদের কোন রকম সাক্ষ্যই জায়িয নয় এমনকি তাদের সংখ্যা অধিক হলেও। তবে তাদের সাথে পুরুষ থাকলে জায়িয হবে।"[৪৯]

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতগুলোর সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, শরীয়তের বিধান নারী ও পুরুষ সবার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কোন বিধানের শেষে নারীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করার অর্থ কখনো এ নয় যে, তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে নারীর ওপর শরীয়তের অধিকাংশ বিধানই প্রযোজ্য হবে না। নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজনের তাগিদে গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের বক্তব্যের এরূপ ব্যাখ্যা করা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, এ মতের ধারক ও বাহকগণ নিজেরাই স্বীকার করেন যে, দুইজন পুরুষ সাক্ষ্যদাতা থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই বক্তব্যে একটি বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো, ঋণ আদান প্রদান হোক বা অনুরূপ অন্য কোন ব্যাপার হোক

---

৪৮. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৪৯. ইমাম শাফেয়ী, *কিতাবুল উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৪৩

সরাসরি তার মুখোমুখি হতে হয় পুরুষকে। এ কারণে শরীয়তে মূলত তাদের সাক্ষ্যের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নারীর এসব ব্যাপারে অংশগ্রহণের অল্পই সুযোগ সৃষ্টি হয়। অতএব, তার সাক্ষ্যদানের বিষয়টা প্রাসঙ্গিক ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।[৫০]

দ্বিতীয়ত, নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সকল ক্ষেত্রে কোন না কোন পুরুষকে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তার সাথে শরীক থাকতে হবে, তাদের এই যুক্তি প্রমাণও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এ ধরনের যুক্তি প্রমাণকে সঠিক বলে মেনে নিলে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, এই আয়াতে সাক্ষ্যদানের যে দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে কোন দাবি প্রমাণ করার জন্য কেবল ঐ দু'টি পথই আছে। অথচ ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফিয়ী রহ. স্বীকার করেন যে, আয়াতটিতে যেসব উপায় ও পদ্ধতির উল্লেখ আছে তা থেকে সরে গিয়ে কেউ যদি তার দাবি প্রমাণ করার জন্য কেবল একজন সাক্ষী পেশ করে এবং নিজে শপথ করে তাহলে তার দাবি প্রমাণিত হবে।[৫১]

হানাফীগণ এসব আপত্তি ও অভিযোগ থেকে নিজেদের দূরে রেখে অত্যন্ত সতর্ক ও যুক্তিসংগত ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। হানাফী ফিক্‌হের চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কে একই চিন্তা-গোষ্ঠীভুক্ত সুপণ্ডিত আল্লামা আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর আলোচনার হুবহু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা হলো :

> কোন অবস্থায়ই আয়াতটির অর্থ এ নয় যে, নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যের বিকল্প। কারণ, এ অবস্থায় তার অর্থ হবে, সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি মূলত একটিই। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা, সমস্ত মুসলিম ন্যূনতম এতটুকু ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দুইজন পুরুষের অবর্তমানে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, কুরআন মাজীদ সাক্ষ্যদানের দুটি ভিন্ন ব্যবস্থা পেশ করেছে। নারীর এই মর্যাদা যখন স্বীকৃত যে, সে সাক্ষী হতে পারে, তখন যেখানেই সাক্ষ্যের প্রয়োজন দেখা দেবে সেখানেই আমরা তাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করতে পারি। যেমন নবী স. বলেছেন, একজন অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। বিবাহ সম্পর্কিত আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদান নীতি অনুসারে বিয়েতে দুইজন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়ে সাক্ষী নির্ধারণ করা আমাদের জন্য জায়িয। শরীয়তের একটি নীতি হলো- দাবিদারের দায়িত্ব হলো প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদী বা আসামীর দায়িত্ব হলো শপথ করা, এ নীতি অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি তার প্রমাণ হিসেবে নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য পেশ করে তাহলে তার দাবি প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া উচিত।[৫২]

---

৫০. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৫২. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, লেবানন : দারুল ফিকর, তা. বি. ১ম খ., পৃ. ৫৯৫-৫৯৬

নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত "একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যখন তোমরা ঋণ আদান প্রদান করো"- প্রমাণ করে যে, নারীর সাক্ষ্য কেবলমাত্র অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, এ বক্তব্যের মাধ্যমে শুধু ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন তার সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেনি। বরং ঋণ পরিশোধের জন্য যে মেয়াদ নির্দিষ্ট হবে সে ব্যাপারেও তার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে নির্দেশ দান করেছে। এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, মেয়াদ বা সময় নির্ধারণ শুধুমাত্র আর্থিক ব্যাপারেই প্রয়োজন হয়। কেননা, জীবনের নিরাপত্তা দান এবং স্বাধীন মানুষের সাথে আর্থিক নয় এ রকম বিষয়েরও মুনাফা ও মেয়াদ নির্দিষ্ট হতে পারে। অনুরূপভাবে হত্যার দাবি অথবা হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্য আদালতের বিচারক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে পারেন। সাময়িকভাবে যদিও ধরে নেয়া যায় যে, মেয়াদ নির্ধারণের বিষয়টি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, তবুও বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কারণ, একজন পুরুষের জন্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার মহর প্রদানের ভিত্তিতে অর্জিত হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি নির্ভেজাল আর্থিক ব্যাপার।[৫৩]

অনুরূপভাবে বক্তব্যের বাহ্যিক দাবি দ্বারা যা স্পষ্ট হয় তাহলো, ঋণের অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষ ও নারীর যৌথ সাক্ষ্য গৃহীত হবে। ঋণ এমন একটি বিষয় যা এই মুহূর্তে দেয়া হবে; কিন্তু তার বিনিময় পরে পরিশোধ করা হবে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে যদি পরে তা পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, সেজন্য এক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী হিসেবে রাখতে বলা হয়েছে। ঋণ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি বিয়ের মাধ্যমে কোন নারীকে সম্ভোগ করার অধিকার অর্জন করলো কিন্তু তার বিনিময় অর্থাৎ মহর পরে পরিশোধ করবে বলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল। অথবা হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে মীমাংসা হলো, উক্ত অর্থ হত্যার বিনিময় হিসেবে গণ্য হবে। ভাড়ার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অর্থাৎ ভাড়ায় কোন জিনিস যে সময় দেয়া হচ্ছে তার বিনিময় আমরা পরে পাচ্ছি। কর্জ বা ঋণ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব, লেনদেন ও আদান-প্রদানের যে সব ক্ষেত্র ও অবস্থায় এ অর্থ পাওয়া যাবে সেখানেই কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবেও এমন বহু নজীর আছে, যা থেকে এরূপ ধ্যান-ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. ধাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এ কথা সবারই জানা যে, সন্তান প্রসবের বিষয়টির অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক

---

৫৩. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬

নেই। এ ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আর ভিন্ন মত থাকলে তা আছে সাক্ষীর সংখ্যা সম্পর্কে, সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীর সাক্ষ্যদান শুধুমাত্র আর্থিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়।[৫৪]

আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন, উমর রা. বিয়ের ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.ও অনুরূপ মত ঘোষণা করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আবু লাবীদ বর্ণনা করেছেন, উমর রা. তালাক সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আতা এবং শা'বী রহ.ও তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহ. আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য জায়িয। কাজী শুরাইহ রহ. দাসত্ব বিষয়ে নারী পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য সঠিক বলে স্বীকার করেছেন।[৫৫] সুতরাং এসব দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, আর্থিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

হানাফী ফিকহের আরো একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. নারীর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত : যেনা বা ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান। চারজন পুরুষের সম্মিলিত বর্ণনা দ্বারা এ সাক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করে। তাই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾

ব্যভিচারিণী নারীদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে চারজনকে সাক্ষী বানাও।[৫৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের সম্বোধন করে "তেমাদের মধ্যে থেকে চার" কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে যদি তিনজন পুরুষ এবং দুইজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে কুরআনে বর্ণিত সংখ্যা দ্বারা যাদের গণনা করা হয়েছে তার উভয়টিরই পরিপন্থী হয়। বরং বলা যেতে পারে যে, যৌথ সাক্ষ্যের সাধারণ মূলনীতি এবং এই আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। অর্থাৎ এই মূলনীতির দাবি হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়াটাই যথাযথ। কিন্তু এই আয়াত ব্যভিচারের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

---

৫৪. আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৪

৫৫. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৫৬. আল কুরআন, ৪ : ১৫

এর জবাব হলো, এই আয়াতটিকে সাধারণ মূলনীতির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কারণ, বৈধ হওয়া ও হারাম হওয়ার বিধানটিই মেনে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, শরীয়তের নির্দেশ হলো যতদুর সম্ভব তোমরা 'হুদুদ' বা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করো। ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য যদি চারজন সাক্ষীই পুরুষ হওয়া জরুরী হয় এবং এতে কোন নারীকে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এই শর্তের কারণে ব্যভিচার প্রমাণ করা তত সহজ হবে না, যত সহজ হবে এই শর্ত না থাকলে। এভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্যও পূরণ হবে।

তৃতীয় কথা হলো, কুরআন যে ভাষায় নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে অর্থাৎ যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী বানাও। এ কথার অর্থ এ নয় যে, যৌথ সাক্ষ্যের স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই। তা বরং দুই পুরুষের সাক্ষ্যের বিকল্প তা সত্ত্বেও কুরআনের এ বক্তব্য থেকে এ সাক্ষ্যের বিকল্প হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং একজন আলিম বিকল্প হওয়ার এ সন্দেহ পোষণও করেছেন। আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে হুদুদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জায়িয নয়।[৫৭]

দ্বিতীয়ত : ব্যভিচার ছাড়া অন্যান্য হুদুদের সাক্ষ্য। এই দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কারণে নারীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তা প্রমাণের জন্য চারজনের পরিবর্তে দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট। কিসাসের বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত : তৃতীয় প্রকারের সাক্ষ্যের মধ্যে কিসাস বা হুদূদ এবং নারীর বিশেষ সমস্যাসমূহ ছাড়াও অন্য সব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক অধিকারসমূহের সাথে তার সম্পর্ক থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। যেমন, বিবাহ, তালাক থেকে রুজু করা, ইদ্দত পালন, গর্ভধারণ নিবৃত্তি, সন্তান, বংশ ও বংশ মর্যাদা, ওয়াক্ফ, সন্ধি, দান, স্বীকৃতি, অছিয়ত; উকালত এবং দাস মুক্ত করা ইত্যাদি। এর সবগুলো ব্যাপারে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত : এরপর শুধুমাত্র সেইসব বিষয় থাকে যে সব বিষয়ে কেবল মেয়েদেরই জানা থাকতে পারে। যেমন, জন্ম, কুমারিত্ব, গোপনীয় স্থান সমূহের দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি। সুতরাং এসব বিষয়ে একজন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর যদি পুরুষ সাক্ষী পাওয়া যায় তবে তা আরো ভালো।[৫৮]

---

৫৭. আল জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৮

৫৮. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

এ আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, হানাফী ফিক্হবিদগণ অন্য কিছু সংখ্যক ফিক্হবিদের তুলনায় এ বিষয়টি ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং শরীয়তের বক্তব্য ও দলীলের পেছনে যে সব কার্যকারণ ও যুক্তি কাজ করেছে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

হানাফী ফিক্হবিদগণ জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে যেভাবে ভাগ করেছেন তাতে ব্যভিচার ও নারীদের নির্দিষ্ট সমস্যাসমূহ ছাড়া আর সব সমস্যা ফয়সালার জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক বলে মনে করেছেন। 'সর্বাবস্থায়ই দুইজন সাক্ষী আবশ্যক, না কি একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও ফয়সালা করা যায়?'- এখানে এ বিষয়টি যে প্রশ্নের অবতারণা করে তা হলো, মেয়েলী সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার মধ্যে এমন কী মৌলিক পার্থক্য, যার কারণে প্রথম প্রকারের সমস্যার ক্ষেত্রে শুধু একজন সাক্ষী যথেষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমস্যার জন্য তা হয় না? হানাফী ফিক্হের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী রহ. এর যে জবাব দিয়েছেন তা নিম্নরূপ। তিনি বলেছেন,

> নবী-রাসূল ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য দ্বারা অকাট্য ও নিশ্চিত কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ, তাতে সর্বাবস্থায় কোন না কোন দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। শুধু নবী-রাসূলগণই এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন যে, তাঁদের বক্তব্য সব রকম সন্দেহের উর্ধ্বে। কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মানুষের সাক্ষ্য বড়জোর একটা দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আর দৃঢ় ধারণা লাভের জন্য (নারী হোক বা পুরুষ হোক) একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মানুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কুরআন মাজীদ সাক্ষ্যদানের জন্য যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছে তা নিছক ইবাদত। এর অন্তর্নিহিত যুক্তি ও কৌশল বুদ্ধি-বিবেকের গণ্ডি বহির্ভূত। তাই এসব নীতিমালার যে রূপরেখা ও নিয়ম কানুন শরীয়ত নির্দিষ্ট, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা উপর্যুক্ত নীতি মেনে চলবো। সুতরাং নারী যখন পুরুষের সাথে একত্র হয়ে সাক্ষ্যদান করছে তখন ইসলাম তার সাক্ষ্যদানের একটা বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে কেবল নারীই সাক্ষী সে সব ক্ষেত্র সম্পর্কে কুরআন কোন বক্তব্য পেশ করেনি। সেই সব ক্ষেত্রে আমরা সেই সাধারণ সূত্র অনুসারে কাজ করবো। নবী স. এর জীবন আদর্শ থেকেও আমরা এর সমর্থন পাই। তিনি জন্মের ব্যাপারে একজন মাত্র ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।[৫৯]

এই প্রমাণটি সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথম আপত্তি হলো, এ প্রমাণটিকে যদি সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়, তা হলে নারীদের নির্দিষ্ট সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যই পূর্ণাঙ্গ এবং একজন পুরুষের সাক্ষ্য

---

[৫৯] আল-কাসানী, *বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারাই*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৮

অপূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ, শরীয়ত সাক্ষ্যের যে নিয়ম-কানুন ও রূপরেখা পেশ করেছে তাতে হয় দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যের উল্লেখ আছে, নয়তো একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর নারীর সাক্ষ্যের উল্লেখ আছে। শুধু একজন পুরুষের সাক্ষ্যের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু হানাফী ফিক্‌হবিদদের কাছে এর জবাব এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, যেসব ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, সে সব ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্য আরও অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এই নীতির দ্বিতীয় দাবি হলো, দৃঢ় ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষ এবং নারী যখন সমান তখন উভয়ের সমান মর্যাদা পাওয়া উচিত। কিন্তু হানাফীগণ কোন ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক ও বোধকে সমান মনে করেননি।[৬০]

এর তৃতীয় দাবি হলো, পৃথিবীর প্রতিটি ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুধু একজন সাক্ষ্যই যথেষ্ট হওয়া উচিত। অথচ বিভিন্ন ব্যাপারে কুরআন সাক্ষীর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করেছে। এর জবাবে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, সাক্ষীর নেসাব বা সংখ্যা একটি ইবাদতের হুকুম মাত্র। কারণ, এ নির্দেশের মধ্যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল আছে। আল্লামা কাসানী রহ. নিজেও যা স্বীকার করেছেন,

> শুধু এক ব্যক্তির ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কেননা, মানুষের প্রকৃতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসতর্কতা বিদ্যমান। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এ জন্য যে, যদি ভুল হয়ে যায় কিংবা অসতর্কতা এসে পড়ে, তা হলে সাক্ষীরা পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের স্থলে দুইজন নারী হওয়ার বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ভুলে যাওয়ার কারণটিই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ ভুলে গেলে অন্যজন যাতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।[৬১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত হলো, প্রকৃতপক্ষে এটাই যদি যুক্তি ও কৌশল হয়ে থাকে। আর যুক্তি এবং কৌশলও এমন যে, তা উপেক্ষা করে একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে এর স্বাভাবিক দাবি হবে, নারীর একান্ত নিজস্ব সমস্যাসমূহের ফয়সালার জন্য কমপক্ষে দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে আবশ্যক করে দিতে হবে। আর ইমাম শাফি'য়ী রহ.-এর মত হলো, নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে দুর্বল করে ধরে নিলে তো চারজন নারীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন ফয়সালা করা সঠিক বলে মনে হয় না।[৬২]

---

৬০. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯২

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

এ ক্ষেত্রে হানাফী ফিক্হবিদগণ একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, তা হলো হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কারণ, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ায় তার সাক্ষ্যে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হুদুদ ও কিসাস প্রমাণের জন্য শরীয়ত অকাট্য ও অত্যন্ত নিশ্চিন্ত দলীল প্রমাণ দাবি করে। অবশিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে শরীয়ত ততটা অকাট্যতা আবশ্যক বলে মনে করে না। তাই দলীল প্রমাণের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ-সংশয় থাকা সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যেতে পারে। এই মূলনীতি অনুসারে হুদুদ ও কিসাস ছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ফয়সালা শুধু নারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সঠিক হওয়া উচিত। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষেত্রগুলো ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ততক্ষণ প্রস্তুত নন, যতক্ষণ না কোন পুরুষ সাক্ষী হিসেবে তাদের সাথে শামিল হবে। তাদের মতে, "কিয়াসের দাবি হলো, শুধু নারীদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা কার্যকরী না করার কারণ হলো, এভাবে ঘরের বাইরে নারীদের গমনাগমন অধিক মাত্রায় হতে থাকবে।"[৬৩]

নারীদেরকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্য ও বিবৃতিতে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়। হানাফীদের এই দাবি সম্পর্কেই মূল প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে এ দাবির সমর্থন পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মেয়েদের কোন সমাবেশে ঝগড়া হলো এবং এর পরিণামে একজন মহিলা নিহত হলো। হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারিণী আটজন মহিলা সম্মিলিতভাবে বক্তব্য পেশ করলো। বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কি বলে যে, তাদের এই সাক্ষ্যের এতটুকু গুরুত্বও নেই যতটুকু গুরুত্ব আছে চারজন সাধারণ পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের? এর চেয়ে অধিক বিস্মিত হতে হয় এ কথা চিন্তা করে যে, কোন আর্থিক লেনদেনের চুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য হানাফীদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ের মামলার ক্ষেত্রে একটি দুইটি নয়, বহু সংখ্যক মহিলার সাক্ষ্যও নির্ভরযোগ্য নয়। নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে এটা চরম নেতিবাচক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৬৪]

---

৬৩. ইমাম শাওকানী, *আল-ইনায়াতুল মাতবূ' আলা হাশিয়াতি ফাতহিল কাদীর*, লেবানন : দারু ইহইয়িত তুরাসিল আরাবী, খ. ৬, পৃ. ৮

৬৪. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪
আল্লামা ইবনে হাযম রহ. এর মতে, "এ কথা স্পষ্টত প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা বা মিথ্যার ওপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একজন নারী ও একজন পুরুষ, দুইজন নারী ও দুইজন পুরুষ এবং চারজন পুরুষ ও চারজন নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অসতর্ক হওয়ার ব্যাপারেও নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যদি তা সামান্য সময়ের

আল্লামা ইবনু কাইয়িম রহ.-এর মতে, দুইজন নারী একমত হয়ে সাক্ষ্য দিলেও তা দুর্বল সাক্ষ্য হবে আমরা এ কথা স্বীকার করি না। এ কারণে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও আমরা পুরুষের সাথে দুইজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করে থাকি। অতএব, এ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী মূল বিষয়, কোন বিকল্প নয়। সততা, বিশ্বস্ততা ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে একজন মহিলা একজন পুরুষের মতই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার ভুল ত্রুটির আশংকা থাকার কারণে তার মত আরেকজন নারীর সাহায্যে তাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অন্য একজন নারীর সমর্থন তাকে একজন পুরুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কিংবা অন্ততপক্ষে তার সমকক্ষ করে দেয়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য থেকে যে ধারণা লাভ করা যায়, তা দুইজন নারীর কিংবা তার মত আরো একজন নারীর সাক্ষ্য থেকে অর্জিত ধারণা থেকে নীচু মানের হয়ে থাকে।[৬৫]

হুদুদের (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণ আরো যে কয়টি দলীল পেশ করেছেন তাও দুর্বল। যেমন, ব্যাভিচারের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কুরআন পুরুষদের সম্বোধন করে বলেছে : 'তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী হবে'। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সম্বোধনের মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রশ্ন হলো, নারীদের এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করলে সংখ্যা চারের অধিক হয়ে যায়। কারণ, একজন পুরুষের স্থলে একজন নারী নেয়া যাবে না বরং দুইজন নারীকে নিতে হবে। এ বিষয়টির শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে কোন মিল নেই। কারণ, এখানে বিশেষ কোন সংখ্যার আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। বরং গুরুত্বের বিষয় হলো উক্ত সংখ্যা দ্বারা অর্জিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার। যদি দুইজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা একজন পুরুষের সাক্ষ্যের মত বিশ্বাস ও নির্ভরতা লাভ করা যায়, তাহলে তা গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়।[৬৬]

অন্যদিকে ইমাম ইবনু হাযম আয-যাহিরীর মতে, সকল ক্ষেত্রেই নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং আর্থিক বিষয়ের মতো অন্য বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক হবে না; বরং সমান হবে। আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ এ মত গ্রহণ করেন। তাঁরা এ ব্যাপারে যে সব যুক্তি দেন তা নিম্নরূপ :

জন্যও হয়। (নারী ও পুরুষ উভয়েই এর শিকার হতে পারে)। এ দিক দিয়ে বিচার করলে চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের তুলনায় আটজন নারীর সাক্ষ্যে মন বেশী তৃপ্তি লাভ করে।" -ইবনে হাযম, *আল মুহাল্লা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪০৩

৬৫. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

- কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এর মধ্যে মাত্র এক জায়গায় (আর্থিক বিষয়ে) দুইজন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর কথা বলা হয়েছে।[৬৭]
- সূরা আন্-নূর এর ৭ এবং ৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, নারী এবং পুরুষের সাক্ষ্য সমান মানের, যেখানে স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক অপরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে একজনের কসম খাওয়া অভিযোগ নাকচ হয়ে যায় অপরজনের কসম খাওয়ার মাধ্যমে।[৬৮]
- সাক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুরআনের অন্যান্য জায়গায় নারী পুরুষের বেলায় ভিন্ন করে বা নির্দিষ্ট করে (পুরুষ হবে বা নারী হবে বা দু'জনেই হবে এমন) কিছু বলা হয়নি।
- রাসলুল্লাহ স. এর জীবনে এরূপ কয়েকটি ঘটনাও দেখা যায় যে, তিনি শপথের ভিত্তিতে মাত্র একজন পুরুষ বা মহিলা সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন।
- কুরআনের শিক্ষা থেকে এটাও স্পষ্ট যে, সাক্ষী হওয়াটা কোনো অধিকার বা সুযোগ নয়; বরং এক দায়িত্ব বটে। কুরআন বলে কেউ সাক্ষ্য দেবার ডাক পেলে যেন অনুপস্থিত না থাকে। কারণ সত্য গোপন করা অপরাধ।[৬৯]
- সর্বশেষে এই কথা বলা যায় যে, সাক্ষ্য প্রদান সকল মুসলিমের দায়িত্ব। কাজেই যদি এমন হয় যে, কোনো অপরাধ সংঘটিত হল যার সাক্ষী এক বা একাধিক নারী। এ অবস্থায় কি শুধু সাক্ষী নারী এই অজুহাতে বিচার বন্ধ থাকবে?[৭০]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ইসলামী আইনে সাধারণত সর্বক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য কম-বেশি গ্রহণ করা হয়। তবে পুরুষের কর্ম জীবনের সাথে যে সব বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত এবং নারীর কর্মক্ষেত্র বহির্ভূত, সে সব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যে পুরুষের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই যদি পুরুষ সাক্ষী পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে নারী সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত

---

৬৭. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৬৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৭, ৯

৬৯. আল-কুরআন, ২ : ১৪০

৭০. ড. জামাল আল-বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, অনুবাদ : ডা. আবু খলদুন আল মাহমুদ, ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৮, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ৩৩০-৩৩১

হয় না; কিন্তু যদি পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে শুধু নারীর সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। এমনকি কিসাস ও হুদুদের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায় এবং সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে কেবল নারীই অবগত থাকে, তা হলে প্রয়োজনে এ অবস্থায় (কারো কারো মতে) ন্যায়বিচারের স্বার্থে নারীর সাক্ষ্যও গৃহীত হতে পারে।

আল-কুরআনে সাক্ষীর সংখ্যার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান থাকার কারণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾

> তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। দু'জন পুরুষ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট, যাতে একজন স্ত্রীলোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রীলোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।[৭১]

আল-কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে বর্তমান সমাজে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এই আয়াতকে কেন্দ্র করে অনেক ইসলাম বিদ্বেষী এরূপ মন্তব্য করেন যে, উক্ত আয়াতে "একজন পুরুষ ও দুইজন নারী" দ্বারা নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে পুরুষের চেয়ে হেয় করা হয়েছে।

তাদের মতের জবাবে সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, আল-কুরআনে উল্লিখিত উক্ত পার্থক্যের সাথে নারী-পুরুষের মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ হিসেবে নারী পুরুষের মতই সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। উক্ত আয়াতে একজন পুরুষের সাথে সাক্ষী হিসেবে দু'জন নারীর শর্ত আরোপের কারণ তার সম্মান ও মর্যাদাকে খাটো করা নয়। বরং এর কারণটি নারীর সম্মান ও মর্যাদার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। তাই একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ইসলাম নারীকে সকল বিষয়ে পুরুষের সমান মর্যাদা, অধিকার দান করেছে; তথাপি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে সামাজিক দায়িত্বটি অর্পণ করেছে, তা হলো পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারীকে বেশিরভাগ সময় গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে হয়। যার ফলে বাহ্যিক সকল ঘটনাবলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তার হয় না। যদিও বা কখনো সুযোগ ঘটে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে সে ওটাকে স্মরণে রাখতে পারে না বা স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। পরবর্তীতে ঐ সকল ঘটনার জন্য যদি তাকে সাক্ষ্য

---

৭১. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

দিতে বলা হয় তখন সে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে না। কারণ পুরো ঘটনা স্মরণ রাখতে আগ্রহী না হওয়ার কারণে সে ঘটনার আংশিক অংশ ভুলে যেতে পারে। আর এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যাহত হতে পারে। তাই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সেক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ আবশ্যক। কারণ দুইজনের একসাথে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে বা একজন ভুলে গেলেও অপরজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর মানব অধিকার এমন একটি বিষয়, যার ব্যাপারে সাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক এবং সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী। এ কারণেই মহিলা সাক্ষীর ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সাক্ষীর বিধান দিয়েছে।[৭২] তাইতো বিষয়টি আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾

যাতে একজন নারী ভুলে গেলে অপরজন নারী তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।[৭৩]

এখানে বলা হয়নি যে নারীর স্মরণশক্তি কম। এখানে মূলত অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা মানুষের কাছে ঋণ ও অর্থনৈতিক বিষয় খুবই স্পর্শকাতর এবং একজন নারী, যে ঘরের কাজে ব্যস্ত, তার পক্ষে আর্থিক চুক্তির জটিল ধারাগুলো সব মনে নাও থাকতে পারে।[৭৪]

---

৭২. নারীর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুসংখ্যক ফিক্‌হ শাস্ত্রবিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হল : নারীরা অধিকাংশ সময় নিজ গৃহে অবস্থান করে এবং সেখানে সহিংসতা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও দৈবক্রমে নারী কোন সহিংস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়, তবে হত্যার ন্যায় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা এবং সহ্য করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে (নারী) হয় দৌড়ে পালাবে, না হয় চোখ বন্ধ করবে, নয়ত মূর্ছা যেতে পারে। কারণ নারীর মানসিক শক্তি, সাহস ও স্থিরতা দুর্বল। এমতাবস্থায় তার পক্ষে পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য দেয়া, অপরাধ, অপরাধী, অপরাধ সংগঠনের হাতিয়ার ও কীভাবে তা সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত সঠিক বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। অথচ ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধির যাবতীয় দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলেই তা বাতিল হয়ে যায় এবং এটা সর্বসম্মত ব্যাপার। তাই হত্যাকাণ্ডের ন্যায় লোমহর্ষক অপরাধ সংঘটনের সময় নারীর যে মানসিক অবস্থা হওয়ার কথা, তাতে অপরাধের সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটাই সন্দেহজনক। এই সন্দেহের কারণেই নারীর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দুইজনের কথা বলা হয়েছে, যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ রাখতে পারে। দ্র. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

৭৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮২

৭৪. ড. জামাল আল বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

তবে যেসব ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি কম সেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তেমনি যেসব ক্ষেত্রে নারী ব্যতীত কোন পুরুষের প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া আদৌ সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণ করাকে অনুমোদন করে। উদাহরণস্বরূপ, সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় প্রমাণ করা, কোন নারীর কুমারিত্ব প্রমাণ করা এবং কোন যৌন ক্রটিতে আক্রান্ত কিনা তা প্রমাণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৭৫]

সুতরাং 'ইসলাম নারীকে কম মর্যাদা দিয়েছে' এই অপবাদ আরোপ করে ইসলামকে তিরস্কার করা একেবারেই অর্থহীন। কেননা ইসলাম অকাট্যভাবে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে। আর সাক্ষ্যের ব্যাপারে আল-কুরআনে যে দুই জন নারী ও একজন পুরুষের কথা বলা হয়েছে তার পেছনে সুস্পষ্ট কারণ ও যুক্তি রয়েছে এবং এটি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে নারীর সাক্ষ্য প্রদানের দৃষ্টান্ত সম্বলিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স. নারীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অনেক বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। অতএব একথা বলা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষেত্রবিশেষে নারী-পুরুষের যৌথ সাক্ষ্য গৃহীত হবে আবার ক্ষেত্রবিশেষে শুধু নারীর একক বা দ্বৈত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ওপর সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত। যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বা সত্য সম্পর্কে অবগত সেই সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে, এটি ব্যক্তির নৈতিক, আইনী ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে হবে। আর নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন ঘটনা প্রমাণ করার জন্য এক বা দুই ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করে বরং ভেতর ও বাইরের বহু আলামত বা নিদর্শনের ওপর শরীয়ত অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এ কারণেই শরীয়ত মানুষের অখণ্ডনীয় ও স্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর চূড়ান্ত ফয়সালার ভিত্তি স্থাপন করে। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষ মুখ্য বিষয় নয়। তাছাড়া কুরআন, হাদীস ও ফিক্হবিদদের মতামত পর্যালোচনা করে এবং

---

৭৫. ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩। অবশ্য বিষয়টি অতীত যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন ধাত্রীবিদ্যা, নারীদের চিকিৎসা ও গোপন বিষয়গুলি নারী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের তাগিদে সাক্ষ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। এমনকি প্রয়োজনে হদ্দ ও কিসাসের মামলায়ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাই একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, ইসলামী আইনে সকল বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যদানের অধিকার স্বীকৃত। আর এই অধিকার ও মর্যাদাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সমাজ থেকে সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত নারী-পুরুষের বৈষম্য বিষয়ক বিভ্রান্তি দুরীভূত করতে হলে ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরী।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৭
জানুয়ারি - মার্চ : ২০১৪

ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের আইনী ব্যবস্থা

মোঃ নুরুল আবছার চৌধুরী*
মোঃ আবদুল লতীফ**

[**সারসংক্ষেপ :** *মহান আল্লাহ এক মানব আদম আ. থেকে তাঁর স্ত্রী, অতঃপর এতদুভয় হতে সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টজীব হিসেবে যেমন রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা; তেমনি আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি দিক থেকেও রয়েছে নারী-পুরুষে সাম্য। মায়ের জাতি নারী সমাজ আজ সমাজের নানা প্রান্তে নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত। নারীজাতি তথাকথিত আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে অপসংস্কৃতি চর্চায় উদ্‌গ্রীব; যার ফলশ্রুতিতে আইয়ামে জাহেলিয়্যাতের ন্যায় এ দেশের নারী সমাজ আজও পদে পদে নির্যাতিত হচ্ছে। ইভটিজিং হলো নারী নির্যাতনের একটি আধুনিক সংস্করণ। ইভটিজিং কী? এর উৎপত্তি এবং এ বিষয়ে দেশীয় ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক ইসলামী আইনের উপযোগিতা তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। যা অন্য সকল অপরাধকে হার মানিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা সংস্কৃতি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে চরিত্রহনন, বিভিন্ন দিবস পালনের নামে তরুণ-তরুণীদের অবাধ উন্মাদনা, আধুনিক পোশাকের নামে উলঙ্গপনা, ফেইসবুকে তরুণ-তরুণীদের অবাধ হৃদয় বন্ধন ইত্যাদি নানাবিধ অনৈতিক কাজের ফলাফল স্বরূপই আজকের সমাজে নেমে এসেছে ভয়াল ইভটিজিং। ইভটিজিং আইন, সমাজ, রাষ্ট্র কারো দ্বারাই প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। মুসলিম সমাজে নৈতিক মূল্যবোধকে পাশ কাটিয়ে ইভটিজিং ঠেকানোও সম্ভব নয়। তাই আজকের সমাজকে ইভটিজিং থেকে বাঁচাতে হলে ইসলামী অনুশাসন ও এর আইনী ব্যবস্থা মেনে চলা অপরিহার্য । কেননা একমাত্র ইসলামী অনুশাসনই হতে পারে ইভটিজিং প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। ইভটিজিং এর পরিচিতি, এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যয়সমূহ, ইভটিজিং প্রতিরোধে দেশীয় ও ইসলামী আইন সমূহ, সর্বোপরি ইভটিজিং প্রতিরোধে একটি সুপারিশমালা পেশ করাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।*]

---

* সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর।
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

ইভটিজিং বলতে কী বুঝায়?

ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত (slang) ভাষা। ইভ (Eve) দ্বারা বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে।[১] আর টিজিং (Teasing) বলতে ঠাট্টা করা, বিরক্ত করা, বিব্রত করা ইত্যাদি বুঝায়।[২] সুতরাং ইভটিজিং (Eve teasing) বলতে নারীর প্রতি বিব্রতকর, লজ্জাকর, নিপীড়নমূলক যে কোনো আচরণ বুঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ শব্দটি (Sexual Harassment) এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। ১৯৯৯ সালে সাংবাদিক সুসান ব্রাউন মিলার সর্বপ্রথম (Sexual Harassment) শব্দটি ব্যবহার করেন।[৩]

পরিভাষায় ইভটিজিং একটি ব্যাপকার্থক পরিভাষা, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে ইভটিজিং (যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন) বলতে বুঝায় :

> শারীরিক স্পর্শের মত অপ্রত্যাশিত যৌনকাঙ্ক্ষামূলক ব্যবহার। প্রশাসনিক, কর্তৃত্বমূলক অথবা পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ বা চেষ্টা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষাগত আচরণ, যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ, পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি। অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষা প্রয়োগসহ যৌন কামনা থেকে হয়রানি। চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টার, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, দেয়াল লিখনের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা। ব্ল্যাকমেইলিং এবং চরিত্র হনন-এর উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ। লিঙ্গীয় ধারণা থেকে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতায় বাধা প্রদান। প্রেমের প্রস্তাব দেয়া এবং প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান। মিথ্যা আশ্বাস, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।[৪]

---

১. Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living. (The Holy Bible, Genesis, 3 : 20)

২. Editorial Board, *Britannica*, USA, Encyclopædia Britannica, Inc, 1768, Vol. 5, p. 119

৩. Susan Brown miller, *In Our Time: Memoir of a Revolution*, New York, Dial Press, 1999. উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে, There once was a time when the concept of equal pay for equal work did not exist, when women of all ages were "girls," when abortion was a back-alley procedure, when there was no such thing as a rape crisis center or a shelter for battered women, when "sexual harassment" had not yet been named and defined.

৪. ২০০৮ সালে যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১৪ই মে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ সকল

এ. এফ. এম সোলায়মান চৌধুরী বলেন, সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যে করে আরেক ব্যক্তি সভ্যতা, ভদ্রতা ও নীতি নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে অশালীন ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি বা বাক্য প্রয়োগ করার একটি মারাত্মক রূপ ইভটিজিং।[৫]

সর্বোপরি ইভটিজিং হলো ব্যক্তি চরিত্রের নগ্ন রূপের এক চরম বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আচরণ, যা শারীরিক নির্যাতন[৬], মানসিক নির্যাতন[৭], যৌন নির্যাতন[৮], নারী নির্যাতন[৯], মানহানি[১০] ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ফৌজদারী কার্যবিধি[১১] মোতাবেক অপরাধ বলে গণ্য, যা শিশু,[১২] সাবালক,[১৩] সকল শ্রেণীর নারীর প্রতি হতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নরোধের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদানপূর্বক নির্দেশনাবলী জারি করেন।

৫. উপ-সম্পাদকীয় কলাম, ইভটিজিং আপন পাগল বেঁধে রাখি, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ঢাকা, ৬ নভেম্বর ২০১০

৬. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮ নং আইন) এর '৩' নং ধারার 'ক' নং উপধারাঃ **"শারীরিক নির্যাতন"** অর্থে এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭. প্রাগুক্ত, '৩' নং ধারার 'খ' নং উপধারাঃ **"মানসিক নির্যাতন "** অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ (অ) মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; (আ) হয়রানি; অথবা (ই) ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ।

৮. প্রাগুক্ত, '৩' নং ধারার 'গ' নং **"যৌন নির্যাতন"** অর্থে যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি হয়।

৯. জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত (১৯৯৩-এর ডিসেম্বর) নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘোষণার (Declaration on VAW) এর ধারা (১) : এই ঘোষণা মতে নারী নির্যাতন বলতে বুঝাবে সেই ধরনের জেন্ডারভিত্তিক সহিংস আচরণ যাতে নারীর শারীরিক মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ও দুঃখ কষ্টের কারণ হবে এবং যাতে কোনো নারীর ব্যক্তিগত ও বাইরের জীবনে নিষ্ঠুরভাবে কোনো স্বাধীনতায় আঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে।

১০. বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা **"মানহানি (Defamation)** : যদি কোন ব্যক্তি জেনে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে অপর কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ প্রণয়ন করে কিংবা সুনাম নষ্ট করার জন্য কোন কার্য করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপর ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে গণ্য হবে।" ইসলামী আইনে মানহানি বলতে : মিথ্যা রটনা, ভুল ধারণা, বিদ্রূপ করা, হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। মানহানির সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কতিপয় আয়াত, ৪৯ (আল-হুজরাত) : ৬,১১-১২, ২৪ (আন-নূর) : ০৪, ১৭ (আল-ইসরা) : ৩৬, ১০৪ (আল-হুমাযাহ) : ০১। (তারেক মোহাম্মদ জায়েদ ও শহীদুল ইসলাম, প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি :

উত্যক্ত করা ও মানহানি করা অর্থে পবিত্র কুরআনে ইভটিজিং শব্দের ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (পর্দানশীন হিসেবে) চিনতে পারা যায় ও এর ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৪]

এ ছাড়া কুরআনে একে অপবাদ নামেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত।[১৫]

সুতরাং বুঝা যায় যে, ইভটিজিং মূলত মানুষের একটি বিকৃত আচরণ ও অনৈতিক কর্ম। যার সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়া হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল-হাদীসে।

ইভটিজিং- এর ধরণ ও এর অন্তর্ভুক্ত কাজ

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি, সমাজে নানাভাবে-নানারূপে ইভটিজিং লক্ষণীয়।

ক. বাচনিক কার্যাবলী : অশালীন মন্তব্য, শিস বাজানো, যৌন আবেদনময়ী গান, হুমকি প্রদান, যৌন সম্পর্কের আবেদন, প্রস্তাব, অনভিপ্রেত বিয়ের প্রস্তাব।

একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১০, পৃ. ১২৯-১৪৭)

১১. **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of criminal procedure, ১৮৯৮ (Act 5 of 1898)

১২. **"শিশু"** আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি। (পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮ নং আইন) এর '২' নং ধারার '১৮' নং উপধারা)। ইসলামী দৃষ্টিকোণে **"শিশু"** হলো ১৪/১৫ বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত। (মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়স-সীমা : সমস্যা ও সমাধান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ : ৪৮, সংখ্যা : ৪র্থ, এপ্রিল-জুন : ২০০৯, পৃ. ১৯৫)

১৩. বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য সব ব্যক্তি (১ম অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত) আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার পর সাবালকত্ব লাভ করেছে মর্মে গণ্য হবে এবং তদ্‌পূর্বে নয়। (সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ (১৮৭৫ সালের ৯নং আইন) এর '৩' নং ধারার ২য় অনুচ্ছেদ)

১৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯

১৫. আল-কুরআন, ২৪ : ২৩

খ. অবাচনিক কার্যাবলী : লোলুপ চাহনি, উস্কানিমূলক তালি, কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শন, কামোদ্দীপক গানবাজনা, অশুভ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি, পিছু নেয়া, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ দেয়া, মিসকল দেয়া, fling kiss (উড়ন্ত চুমু), চলার পথে বাধা দান, ই-মেইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ দেয়া ইত্যাদি।

গ. শারীরিক কার্যাবলী : ঘাড় ও কাঁধে হাত দেয়া, গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া, শরীরে ধাক্কা দেওয়া, ব্লাকমেইল করার অভিপ্রায়ে চিত্র ধারণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইভটিজিং

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে একটি মারাত্মক সমস্যা। যার ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের পারিবারিক, সামাজিক সহ সকল ক্ষেত্রকে আক্রান্ত করছে। বাংলাদেশে সংঘটিত 'ইভটিজিং' এর একটি সমীক্ষা নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, গত এক বছরে ইভটিজিং এর অপরাধে মামলা হয়েছে ১০৫টি, জিডি ৩৩৭টি, থানায় অভিযোগ ১২৯৬ জনের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৫২০ জন।[১৬]

২. জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির গবেষণা অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৭ মেয়ে বখাটেদের উৎপাতে আত্মহত্যা করে। আর ২০১০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫তে এবং মোট ইভটিজিং এর প্রত্যক্ষ শিকার হয় ৫২ জন।[১৭]

৩. বিভাগভিত্তিক কয়েক মাসের ইভটিজিং এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়; রাজশাহীতে ১৩টি মামলা, সিলেটে ১৮টি মামলা, বরিশালে ২৭টি মামলা, ৪টি জিডি, রংপুরে ৫টি মামলা, চট্টগ্রামে ২৩৭টি ইভটিজিং এর ঘটনা ঘটে।[১৮]

ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে এখন আক্রমণের শিকার হচ্ছে অভিভাবক। যেমন : নাটোরের মিজানুর রহমান, ফরিদপুরের চাঁপা রাণী ভৌমিক। এমতাবস্থায় দেশব্যাপী ইভটিজিং এর প্রতিরোধে সভা, সেমিনার, প্রবন্ধ রচনা, আইন প্রণয়ন, মিছিল, মানব বন্ধনসহ নানা আয়োজন চলছে।

ইভটিজিং এর কারণ

ইভটিজিং একটি অপরাধ, এ অপরাধের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। অপরাধ সংঘঠনের পেছনে স্থান-কাল, অবস্থান, ব্যক্তির মূল্যবোধ ইত্যাদি জড়িত। ইভটিজিং সংঘঠনের কারণগুলোর অন্যতম কয়েকটি হলো- ১. স্বভাবজাত ঝোঁক, ২. ইসলামী

---

১৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ০৯

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

শিক্ষার অভাব, ৩. ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতা, ৪. অশালীন পোশাক, ৫. মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি, ৬. পারিবারিক শিক্ষার অভাব, ৭. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, ৮. অপসংস্কৃতির প্রভাব, ৯. আইন ও বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা, ১০. নেশা ও মাদকতা, ১১. বেকারত্ব, ১২. সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকা,[১৯] ১৩. তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার, ১৪. পারিবারিক শৃংখলার অভাব, ১৫. হতাশাব্যঞ্জক জীবন, ১৬. সুস্থ বিনোদনের অভাব, ১৭. প্রশাসনিক অবহেলা, ১৮. আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, ১৯. চলমান অবস্থা থেকে শেখা, ২০. একে অপরের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব।[২০] ২১. মিডিয়ায় অশ্লীলতা, ২২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ২৩. মাতা-পিতার অবাধ্যতা, ২৪. নৈতিক অবক্ষয়, ২৫. যথাযথ আইনের অভাব, ২৬. আইনের প্রয়োগ না থাকা, ২৭. নারীর প্রতি সমাজের (পুরুষদের) নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, ২৮. রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক, ২৯. পর্ণোগ্রাফির ব্যাপক ছড়াছড়ি এবং ৩০. মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি।

ইভটিজিং সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইন

বাংলাদেশে ইভটিজিং সম্পর্কিত অনেক আইন রয়েছে। নিম্নে প্রচলিত কয়েকটি আইনের ধারা উল্লেখ করা হলো,

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা : ১০।

"যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।" [২১]

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩, ধারা : ৯ক।

"নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilful) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন

---

[১৯] মুহাম্মদ আমিনুল হক, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, এপ্রিল-২০১২, পৃ. ২০-২৫

[২০] নাজনীন আখতার, ইভটিজিং-১, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২৯ মে ২০১০, পৃ. ১

[২১] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫ বলে নতুন ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত।

এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।"[২২]

৩. বাংলাদেশে দণ্ডবিধি ১৮৬০ (সংশোধিত) ২০০৪ এর ২৯০, ২৯৪, ৩৫৪, ৫০৯ ধারা।

৪. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ ধারা : ৭৬।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ২নং ধারা।
"রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"[২৩]

এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইভটিজিং প্রতিরোধে এসব আইন সম্পর্কে জানেন না।[২৪] সুতরাং তাদেরকে এসব আইন সম্পর্কে জানাতে এবং আইনের সুফল ভোগ করতে সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী।

ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবধর্মী যুগোপযোগী জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি দিকের সমাধান এ ধর্ম ব্যবস্থা থেকে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾

আমি এ কুরআনকে সকল কিছুর সমাধান স্বরূপ নাযিল করেছি।[২৫]

এমতাবস্থায় ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী ইভটিজিং প্রতিরোধের কারণসমূহের সাথে ইসলামী আইনের কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে তা আলোচনা করা যায়;

দৃষ্টিশক্তির হেফাযত

ইভটিজিং এর পেছনে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কারণ তা হল : অবাধ দৃষ্টি প্রয়োগ। ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামে বর্ণিত দৃষ্টি সম্পর্কিত ফৌজদারী আইনের অনুশীলন জরুরী। মহান আল্লাহর বলেন,

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾

(হে রাসূল) ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে।[২৬]

---

২২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৪ বলে নতুন ধারা ৯ক প্রতিস্থাপিত। উল্লেখ্য ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে 'অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি' শব্দটি ২০০৩ সালের সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে।

২৩. এছাড়াও সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০, ১৯-১,২, ২৭ ২৮-১,২,৩, ২৯-১,২-ধারাগুলো দ্বারা নারী পুরুষের সমতা বিধানের কথা ঘোষণার দ্বারা ইভটিজিং এর প্রতি আইনগত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে

২৪. সারনি-১ দেখুন

২৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

২৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

(অসংযত) দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলো থেকে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে, আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে।[২৭]

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, দৃষ্টিশক্তির অবাধ নিয়ন্ত্রণহীনতার ফলেই ইভটিজিং ঘটছে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলাম প্রদর্শিত প্রন্থায় দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সতর ঢেকে রাস্তায় চলাচল

সতর না ঢেকে উগ্র, অর্ধ উলঙ্গ চলাচলের প্রভাবে সমাজের যুবকদের সুপ্ত যৌন আকাঙ্খা উস্কে দেয়া হয়। যার প্রভাবে ইভটিজিং এর মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়। সুতরাং ইভটিজিং প্রতিরোধে শালীন পোশাক পরিচ্ছদের অনুশীলন জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾

হে বনী আদম!, আমি তোমাদের জন্যে এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম।[২৮]

সতরের সীমারেখা সম্পর্কে হাদীসের বাণী, 'আম্‌র বিন শুআইব রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

নিশ্চয়ই পুরুষের সতর হলো নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।[২৯]

আল্লাহ তাআলার বাণী, وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায়।"[৩০] আয়াতে 'যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায়' দ্বারা অধিকাংশ ইমামের মতে- মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও বহিরাবরণকে বোঝানো হয়েছে।[৩১]

---

২৭. সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব তাবরানী, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, কায়রো : দারুল হারামাইন, তাবি, হাদীস নং : ১০৩৬২

২৮. আল-কুরআন, ৭ : ২৬

২৯. সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়ুব তাবরানী, *আল-মুজামুস সাগীর*, বৈরূত : কুতুবুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৫ হি., হাদীস নং : ৩২২

৩০. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

৩১. ইবনু আব্বাস রা., মুজাহিদ ও 'আতা রা. বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে চেহারা ও হাতের তালুতে ব্যবহৃত রং ও সুরমা। ইবনু উমর ও আনাস রা. প্রমুখ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। ইবনু আব্বাস রা.-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এর অর্থ হলো- হাতের তালু, চেহারা ও আংটি।

সর্বোপরি নারীর সতর সম্পর্কে কতিপয় আলিমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পরপুরুষের সামনে বিনা প্রয়োজনে চেহারা খোলা রাখা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং প্রতিটি নারীর জন্য উচিত হবে, রাস্তায় চলাচল অথবা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেতে হলে অবশ্যই দেহ আবৃত রাখা। পর্দা সংক্রান্ত সূরা আহযাব ও সূরা নূরের সবগুলো আয়াত অধ্যয়ন করলে এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, পরপুরুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডলও সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে। মহিলাদের মুখমণ্ডলের গুরুত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, "মুখমণ্ডল হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিপর্যয়ের উৎস ও বিপদের ঘাঁটি।"[৩২] ইমাম কুরতুবী বলেন, "মুখণ্ডল হচ্ছে রূপ সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল, সৃষ্টিগত সৌন্দর্য এবং নারী জীবনের মাহাত্ম-মাধুর্য এখানেই।"[৩৩] উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হিসেবে আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী রহ.-এর মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "মহিলাদের দিকে তাকানো জায়িয নয় শুধু ফিতনার আশঙ্কায়। আর চেহারা খোলা থাকলে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তা পা, নলা এবং চুল খোলা রাখার চেয়েও মারাত্মক। যেখানে পায়ের নলা এবং চুলের দিকে তাকানো সর্বসম্মতভাবে হারাম, সেখানে চেহারার দিকে তাকানো আরো বেশি হারাম হওয়া উচিত। কারণ তা হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু ও ফিতনার উৎস।"[৩৪]

সুতরাং বোঝা গেলো যে, ইভটিজিং বন্ধে মহিলাদেরকে সতর হিসেবে তাদের মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীরই ঢেকে রাখতে হবে।

সাধারণত কিশোরী, তরুণী ও যুবতীরাই ইভটিজিং এর শিকার হয়ে থাকে। কারণ এ সময় তারা নিজেদেরকে আবেদনময়ী সাজসজ্জা করে পরপুরুষের কাছে উপস্থাপন কর।[৩৫]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ فِي قوله إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ مَا كَانَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَكَذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهَا الْكَفُّ وَالْوَجْهُ وَالْخَاتَمُ আবু বকর আল-জাস্সাস, *আহকামুল করআন*, বৈরুত : দারু ইহয়িয়া আত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি., খ. ৫, পৃ. ১৭২

৩২. মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়িউল বায়ানি ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামি মিনাল কুরআন*, দামেস্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮০ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৫৬

৩৩. فَإِنَّهُ أَصْلُ الزِّينَةِ وَجَمَالُ الْخِلْقَةِ وَمَعْنَى الْحَيَوَانِيَّةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো : দারু কুতুবিল মিসরিয়াহ, ১৯৮৪ হি., খ. ১২ , পৃ. ২২৯

৩৪. মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৩৫. সারণি-২ দেখুন।

রাস্তায় আড্ডা না দেয়া

আজকের সমাজে যে সব স্থানে ইভটিজিং বেশি হয় তা হল রাস্তা, ঘাট, বাজার, বিপণী বিতান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অথচ এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান যদি মানা হত তাহলে মনে হয় ইভটিজিং নামক শব্দটির উদ্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী বলেছেন,

> إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
>
> তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের তো রাস্তার উপরে বসা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আমরা তো সেখানে বসেই আলাপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন– যদি তোমরা একান্তই রাস্তায় বসতে চাও, তা হলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। রাস্তার হক কী? রসূলুল্লাহ স. বললেন, "রাস্তার হক হল– চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা।[৩৬]

আলোচ্য হাদীসের নির্দেশনা যদি সমাজে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে এত আড্ডার আসর হত না এবং ইভটিজিংও হত না। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে রাস্তার হকসমূহের যথাযথ অনুশীলন জরুরী। বাংলাদেশে সংঘটিত ইভটিজিং এর অধিকাংশ ঘটে রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন গার্মেন্টিস-এর সামনে অবস্থানকারী বখাটে উগ্র যুবকদের দ্বারা।[৩৭]

নারীদের রাস্তায় নম্রভাবে চলাচল

ইসলামী অনুশাসন হল নারীরা সাবধানতার সাথে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলাচল করবে নম্র ও শালীন ভাবে। কিন্তু তারা যদি অহংকারের সাথে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করে, তবে তাদের ইভটিজিং এর সম্মুখীন হওয়া অতি সাধারণ। তাই ইসলামী অনুশাসন মান্য করা জরুরী।

---

৩৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাজালিম ওল গাদাব, অনুচ্ছেদ : আফনিয়াতি আদদাউরি ওলজুলুসি ফীহা ওলজুলুসি আলাস সাউদাত, দামেশক : দারু তূকুন নাজাত, ১৪২২ হি., হাদীস নং-২৪৬৫; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-লিবাস ওয যীনা, অনুচ্ছেদ : আন-নাহি আন জুলুসি ফী তুরুকাত ও ইতাইত তারিকি হাক্কাহু, বৈরুত : দারে ইহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২১২১/১১৪

৩৭. সারণি-৩ দেখুন।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾
তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।[৩৮]

পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী বিধিমালা অনুসরণ

নারীর পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী বিধি-বিধানের কয়েকটি হলো-

১. সতর পরিমাণ ঢেকে থাকে এমন ঢিলে ঢালা পোশাক পরিধান করা;
২. প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক না পরা;[৩৯]
৩. জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় নগ্ন পোশাক না পরা;[৪০]
৪. পোশাক স্বচ্ছ পাতলা না হওয়া;[৪১]
৫. পোশাক আঁটসাঁট না হওয়া;[৪২]
৬. নারী-পুরুষের পোশাকে সাদৃশ্য না হওয়া;[৪৩]

---

৩৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

৩৯. আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ "তারা তাদের সৌন্দর্যকে যেন প্রকাশ না করে। (আল-কুরআন, ২৪ : ৩১)

৪০. মহান আল্লাহ বলেন : ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ "জাহিলী যুগের ন্যায় তোমরা সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করো না।" (আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩)

৪১. পর্দার উদ্দেশ্য আবৃত করা এবং তদনুযায়ী সাফল্যের জন্য পাতলা স্বচ্ছ কাপড় দ্বারা পর্দা তৈরী করা ঠিক হবে না। নামে মাত্র পর্দা আর বাস্তবতায় অনাবৃত - এ হতে পার না। মহানবী সা. বলেন, سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ "আমার শেষ জামানার উম্মতের নারীরা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে, তাদের চুলের খোপাকে মনে হবে যেন বুখত উটের কুঁজোর মতো সুউচ্চ। তাদের অভিশাপ দাও, কেননা তারা অভিশপ্ত।" (আত-তাবারানী, *মুজামুস সগীর*, অধ্যায় : বাবুল হা', অনুচ্ছেদ : মান ইসমুহু হারুন, বৈরুত : মাকতাবাতু ইসলামী, ১৪০৫ হি., হাদীস নং- ১১২৫)

৪২. পর্দা ফেৎনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। এটা আঁটসাঁট হলে নারী-পুরুষের দেহ গঠন প্রণালী প্রকাশিত হবে এবং তাতে পর্দার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এ প্রসঙ্গে উসামা ইবনু যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে একটি কুবতী মোটা আঁটসাঁট কাপড় পরার জন্য দিলেন, যা তাঁকে দাহইয়া আল-কালবী রা. উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আমি কাপড়টি নিয়ে আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সা. তা জানতে পেরে বললেন: কী ব্যাপার, তুমি কুবতী কাপড়টি পরলে না? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা., আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন:

مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

"তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশ দেবে, যেন সে এর নীচে একটি অন্তর্বাস পরে নেয়। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এতে তার হাড়গুলোর আকৃতি বাহির থেকে ফুটে ওঠতে পারে।" (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদে আনসার, অনুচ্ছেদ : হাদীসে উসামা বিন যায়েদ হুব্বে রাসূল সা., দামেশক : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি., হাদীস নং- ২১৭৮৬)

৪৩. এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. ইরশাদ করেন : لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ "- যে নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে আর যে পুরুষ নারীর বেশ ধারণ

৭. মুসলিমের পোশাক বিজাতীয় পোশাকের ন্যায় না হওয়া;[৪৪]
৮. যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোশাক না পরা।[৪৫]

সর্বোপরি ইসলাম নির্দেশিত পোশাকের বিধান অনুসারে হিজাব অনুশীলনের মাঝেই নারীর সঠিক মর্যাদা ও কল্যাণ নিহিত। বেপর্দার কারণেই নারী নির্যাতন, ইভটিজিং সমাজে আজ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআনের এ সুন্দর বিধানকে উপেক্ষা করে আজকের সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকুরীজীবীদের কর্মস্থল ইত্যাদিতে শালীনতা বিবর্জিত ও ইসলাম বিরোধী পোশাকের প্রচলন করা হয়েছে, যা ইভটিজিং এর মতো অনভিপ্রেত অপরাধ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলামী পোশাক প্রচলন জরুরী। বাংলাদেশে সংঘটিত ইভটিজিং এর অধিকাংশই নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অশ্লীল পোশাক পরিধানের কারণেই হয়ে থাকে।[৪৬]

নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার

যেহেতু সুগন্ধি ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিত করে, তাই মহানবী স. মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

কোন মহিলা যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর মানুষের পাশ দিয়ে হাঁটে, যাতে তারা তার সুঘ্রাণ পায়, তবে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী।[৪৭]

করে, তারা আমাদের দলের নয় অর্থাৎ তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : মুসনাদে মুকসিরীনা মিনাস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৮৭৫)

৪৪. এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য (পোশাক-পরিচ্ছেদ ও সংস্কৃতিতে) রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।" (ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-লিবাস, অনুচ্ছেদ : বাবু ফি লুবসিস শুহরাতি, বৈরুত : মাকতাবাতুল আসরীয়া, তা.বি, হাদীস নং- ৪০৩১)

৪৫. এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. ইরশাদ করেন : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতিজনক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন, অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করে আগুনে জ্বালাবেন।" (ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-লিবাসি, অনুচ্ছেদ : বাবু মান লাবিসা শুহরাতান মিনা লিবাসি, বৈরুত : দারে ইহইয়া কিতাবুল আরাবীয়্যা, তা. বি., হাদীস নং- ৩৬০৭)

৪৬. সারণি- ৪ দেখুন।

৪৭. আবু আব্দুর রাহমান আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান,* হালব : মাকতাবাতু মাতবাআতু আল-ইসলামীয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী, হাদীস নং : ৫১২৬

সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলামী অনুশাসন মেনে নারীর উচিত হবে সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের না হওয়া।

পরপুরুষের সঙ্গে আবেদনময়ী স্বরে কথা না বলা

পরপুরুষের সঙ্গে নারীর কথা বলার ভঙ্গি ও ধরন এমন হতে হবে, যাতে আলাপকারী পর পুরুষের মনে অশুভ চিন্তার উদয় না হয়। পরপুরুষের ক্ষেত্রে সর্বদা ইসলামের এই অনুশাসনটির কথা স্মরণ রাখতে হবে, যাতে করে কেউ নারীর কথার দ্বারা তার প্রতি আকর্ষিত না হয়। যার কুপ্রভাব হতে পারে ইভটিজিং এর মত জঘন্য কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا ﴾

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[৪৮]

সুতরাং ইভটিজিং প্রতিরোধ আইনের প্রতি যতটুকু গুরুত্বারোপের প্রয়োজন রয়েছে, তার চাইতে বেশি প্রয়োজন হলো ইসলামী অনুশাসনের অনুশীলন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

ইভটিজিং একটি সামাজিক সমস্যা। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মাঝে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা বাস্তবতার তুলনায় আবেগ তাড়িত হয়েই মূলত এ সকল ঘৃণ্য কাজ করে। তাই তাদের সামনে যদি ইসলামী অনুশাসন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে ইভটিজিং বন্ধে তা হবে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উদাহরণ স্বরূপ NCTB অনুমোদিত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম পত্র বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন' অন্তর্ভুক্তি।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা

বর্তমান সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতি মূলত ইভটিজিং এর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধ করতে হলে পশ্চিমা ও ভারতীয় অপসংস্কৃতির বিপরীতে ইসলামী সংস্কৃতির উপর জোর দেয়া জরুরী।

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা জোরদারকরণে-'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' যথার্থ প্রতিষ্ঠান। ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের আরো বলিষ্ঠ প্রদক্ষেপ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাবনা হলো-

* সরকারী উদ্যোগে ইসলামী টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল প্রতিষ্ঠা;

---

৪৮. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩২

* সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালু করা;
* দেশে চলমান টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলগুলোকে ইসলামাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ;
* এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন।

পরিবার প্রথা ও পারিবারিক বন্ধন সদৃঢ়করণ

আধুনিক সমাজ যান্ত্রিক উন্নতিকে আত্মস্ত করতে গিয়ে নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষ 'Living together' পন্থাকে 'Marriage' এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। যা দেখে আমাদের কোমলমতী তরুণ-তরুণীরা ইভটিজিং-এ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। অথচ ইসলাম অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে পরিণত বয়সে ছেলে মেয়েদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও।[৪৯]

আলক্বামাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম, তারা যেন বিবাহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত রাখে।[৫০]

চারিত্রিক উন্নতি সাধন

মূলত চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণেই সমাজে ইভটিজিং এর ন্যায় ভয়াল সামাজিক অপরাধ নেমে এসেছে। তাই ইভটিজিং প্রতিরোধে যে কাজটি সবার আগে করতে হবে তা হলো- ব্যক্তি চরিত্রের উন্নতি সাধন। ইসলামী জীবনাদর্শে চারিত্রিক উন্নতি সাধন একটি মহৎ গুণ। নবী মুহাম্মাদ স. চারিত্রিক উন্নতির পূর্ণতা সাধন করতেই এ পৃথিবীতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ (مكارم) الأَخْلَاقِ

মহান নৈতিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।[৫১]

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি গঠন

মানুষ নৈতিক জীব। নৈতিক জীবনবোধ মানুষকে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেরণা

---

৪৯. আল-কুরআন, ২৪ : ৩২

৫০. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ৫০৬৫

৫১. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম, *আল জামে*, মিশর : দারে মাকতাবা হাসান হুসাইন, ১৪১৬ হি., হাদীস নং : ৪৮৩

যোগায়, ভালো হতে সাহায্য করে। মানুষ নৈতিক ধারণা লাভ করে থাকে ধর্ম থেকে এবং সামাজিক পরিবেশ থেকে। ধর্মই নৈতিকতার[৫২] আসল ও প্রকৃত উৎস। ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে গেলে কিংবা ধর্মের শিক্ষা ও নির্দেশনা ভুলে গেলেও মানুষ তার সামাজিক পরিমণ্ডলের উচিত-অনুচিত বোধ থেকে নৈতিক অবস্থান তৈরি করে নেয়; যা সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ নয়। কেননা, আল্লাহ্ প্রদত্ত তথা স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত নীতিমালা ও বিশ্বাসই মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের চালিকাশক্তি। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ উন্নয়ন ও পরিত্রাণ সম্ভব নয়। এজন্যই সত্য ধর্মাশ্রিত নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। ইসলাম ধর্মই নৈতিকতা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

রসূলুল্লাহ সা. বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

নৈতিকতার বিচারে যে ব্যক্তি উত্তম, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী।[৫৩]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই মূলত সমাজে ইভটিজিং-এর ন্যায় ভয়াল সামাজিক অপরাধ নেমে এসেছে। তাই জাতিকে এ নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হলে যে কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতে হবে, তা হলো- জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় সুন্দররূপে গড়ে তোলতেই এ পৃথিবীতে মহান শিক্ষকরূপে আগমন করেছিলেন।

মাদকাসক্তি দূরীকরণ

মাদকাসক্তি মানব বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের ওপর মারাত্মক ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। মস্তিষ্কের করটেক্স বা উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির স্তর নিস্তেজ হয়ে যায় ফলে মদপানকারী মাতাল হয়ে পড়ে। লজ্জা-সংকোচ কমে যায়, কথাবার্তা বেশি বলে, এমনকি অনেক গোপন তথ্যও বের হয়ে পড়ে। কথাবার্তা জড়িয়ে যায়, এক পর্যায়ে চেতনা হারায়। মাদকাসক্তি মানুষকে শুধু মানবতা ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপের

---

৫২. নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality, যা এসেছে Morals থেকে। এর অর্থ হলো : আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বা Customs প্রথা। আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে خلق খুলুক (Khulq) বহুবচনে أخلاق (Akhlaq) আখলাক।

৫৩. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আবওয়াবুর রিদা, অনুচ্ছেদ : বাবু মা জাআ ফি হাক্কিল মিরআতি আলা জাওজিহা, মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বাবী আল হালী, ১৩৯৫ হি., হাদীস নং-১১৬২

দিকেই উদ্বুদ্ধ করে না, এটা মানুষকে যাবতীয় মন্দ ও ঘৃণ্যতর পাপ কাজের দিকেও ধাবিত করে। এটা মানুষকে চিত্তবিভ্রম, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ব্যভিচার, নরহত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, সড়ক দুর্ঘটনা ও নির্যাতনের মত জঘন্যতম অপরাধের অধিকাংশই মাদকাসক্তিরই পরিণাম। রসূলুল্লাহ স. বলেন, اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثُ "মদ সকল অপকর্মের জননী।"[৫৪] সুতরাং ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে হলে অবশ্যই সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূর করতে হবে।

ফলাফলমূলক পর্যালোচনা

ধর্ম বাংলাদেশের সমাজের চালিকাশক্তি, তাই ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে এদেশ থেকে ইভটিজিং এর প্রতিরোধ সম্ভব। আমরা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমেই ইভটিজিং প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া ইদানীং কালে পত্রপত্রিকায়ও এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।[৫৫] ইভটিজিং এর শিকার অধিকাংশ নারীর মতামত হলো, ইভটিজিং প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন-প্রয়োগের পাশাপাশি ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন জরুরী।[৫৬]

সুপারিশসমূহ

ইভটিজিং প্রতিরোধে আইনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সুপারিশ হলো-

১. আইন মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ইভটিজিং প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন; অথবা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০)' এর সংশোধন করে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন' বিষয়ক ধারা সংযোজন;

২. তথ্য মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রচারকরণ;

৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিক্ষার সর্বস্তরে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ;

---

৫৪. ইমাম দারাকুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আসরিবাতি ওগাইরিহা, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি., হাদীস নং- ৪৬১৩

৫৫. "ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রয়োজন ইসলামী অনুশাসন" এমন আলোচ্য ধারায় আলোচিত কয়েকটি পত্রিকার নিবন্ধ হলো-দৈনিক প্রথম আলো, ২৮/১০/২০১০ শাস্তি হয় না উত্তক্তকারীদের; দৈনিক নয়া দিগন্ত, ইভটিজিং বন্ধে আমাদের দায়িত্ব; দৈনিক নয়া দিগন্ত, ইভটিজিং নৈতিক অধঃপতনই মূল কারণ; দৈনিক নয়া দিগন্ত, ইভটিজিং : আপন পাগল বেঁধে রাখি; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯/১০/২০১০, গুরুতর সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং; দৈনিক নয়া দিগন্ত, জোবাইদা খানম, নারীর জন্য জনপরিসর নিরাপদ হবে কবে; দৈনিক সংগ্রাম, মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, ইভটিজিং প্রতিরোধে ধর্মীয় শিক্ষা; দৈনিক নয়া দিগন্ত, হঠাৎ নারী নির্যাতন মহামারীর কারণ; ইত্যাদি।

৫৬. সারণি-৫ দেখুন।

৪. জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্থান থেকে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' বাস্তবায়নে প্রদক্ষেপ গ্রহণ;
৫. অবাধ নারী স্বাধীনতায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে নারী স্বাধীনতার মূল প্রত্যয় উপলব্ধি করে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা;
৬. ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষাব্যবস্থা ও নারীর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ;
৭. ইসলাম প্রদর্শিত 'মানহানি প্রতিরোধ' আইন মেনে চলা;
৮. পারিবারিক শৃংখলা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ও ইসলামী অনুশাসন গ্রহণে যত্নশীল হওয়া;
৯. নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মানসিকতা সৃষ্টি;
১০. চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা নারীকে মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। অথচ আজ তারা আল্লাহ প্রদত্ত গৌরব ও মর্যাদা ভুলে গিয়ে মেকি ভোগ বিলাস, কামনা-বাসনা, অনৈসলামিক উম্মাদনায় আক্রান্ত। তারা আজ আদর্শ মা ও স্ত্রী হবার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিকা, রক্ষিতা, নায়িকা, মডেল ও খ্যাতি অর্জনে উদগ্রীব। উচ্ছৃঙ্খল, আঁটসাঁট পোশাক আর বেপরোয়া চলন-বলন অব্যাহত রেখে আইন প্রণয়ন অনর্থক। তাই আজকের সমাজ থেকে ইভটিজিং নামক কালো অধ্যায় দূর করতে হলে ইসলামী অনুশাসনের যথাযথ বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট :

সারণি- ১[৫৭]

বিদ্যমান আইন সম্পর্কিত ধারণা তথ্য

বিদ্যমান আইনের ধারনা	গণসংখ্যা ঘ= ১০০	শতকরা
হ্যাঁ	২৭	২৭%
না	৬৩	৬৩%

উপরিউক্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শতকরা ২৭ জন উত্তরদাতা পত্র-পত্রিকা, আইন সম্পর্কিত বই ইত্যাদি মাধ্যম থেকে যৌন হয়রানি সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন সম্পর্কে জেনেছে। আর অন্যদিকে শতকরা ৬৩ জন উত্তরদাতার বিদ্যমান আইন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

৫৭. সারণিতে উল্লিখিত তথ্যাবলী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক মোঃ শরীফুল ইসলাম-এর অধীনে বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ কর্তৃক এপ্রিল ২০১৩ সময়কালে পরিচালিত 'যৌন হয়রানির কারণ ও প্রতিকার' শীর্ষক গবেষণাকর্ম থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি- ২

যৌন হয়রানির শিকারদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

বৈবাহিক অবস্থা	**গণসংখ্যা ঘ=১০০**	**শতকরা**
বিবাহিতা	২০	২০%
অবিবাহিতা	৮০	৮০%
বিধবা	০	০%
তালাক প্রাপ্তা	০	০%

ইভটিজিং একজন মেয়ের জীবনে এক তিক্ত ও অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা। উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইভটিজিং এর শিকার শতকরা ৮০ জন মেয়ে অবিবাহিত। অবিবাহিত মেয়েরা নিজেদেরকে আবেদনময়ী করতে অমার্জিত পোশাক পরিচ্ছদ· পরিধান করে থাকে। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মেয়ে বিবাহিতা। বিবাহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুটরাখা ও নৈতিকতার কারণে আক্রান্তের পরিমাণ কিছুটা কম দেখা যায়। এছাড়াও বিধবা ও তালাক প্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যা শতকরা হিসেবে নেই বললেই চলে।

সারণি-৩

যৌন হয়রানিকারীদের ধরণ সংক্রান্ত তথ্য

কাদের দ্বারা	**গণসংখ্যা ঘ=১০০**	**শতকরা**
আত্মীয়ের দ্বারা	১৮	১৮%
পথচারীদের দ্বারা	৩০	৩০%
সহপাঠীদের দ্বারা	১৭	১৭%
শিক্ষকদের দ্বারা	১৯	১৯%
অন্যান্য	১৬	১৬%

উপরিউক্ত সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তর প্রদানকারী ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩০% যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে রাস্তায় যাতায়াতের সময় পথচারীদের দ্বারা। কেননা রাস্তায় বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার লোকজন চলাফেরা করে থাকে। তাছাড়া শতকরা ১৯ জন ছাত্রী শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। শতকরা ১৮ জন মেয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে আত্মীয়ের দ্বারা। সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে শতকরা ১৭ জন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে রিকসা, ভ্যান ও বাস শ্রমিক, প্রতিবেশী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইত্যাদি ব্যক্তিদের দ্বারাও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।

সারণি-৪

উত্তরদাতাদের যৌন হয়রানির কারণ সম্পর্কিত তথ্য

কারণ	গণসংখ্যা ঘ=১০০	শতকরা
কোন মন্তব্য নেই	৬৪	৬৪%
প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায়	২০	২০%
সুন্দরী হওয়ার কারণে	৩০	৩০%
অশ্লীল পোশাক পরিধান	৩২	৩২%
ছেলেদের খারাপ মনোভাব	২৫	২৫%

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি উত্তরদাতা ৬৪% যৌন হয়রানির কারণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি। কারণ লোকলজ্জা, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে অনেকে যৌন হয়রানির কোন নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি। শতকরা ৩২ জন উত্তরদাতার মতে অশ্লীল পোশাক পরিধান করার কারণে যৌন হয়রানির শিকার হয়। সুন্দরী হওয়ার কারণে যৌন হয়রানির শিকার হয় শতকরা ৩০ জন। ছেলেদের খারাপ মনোভাবের কারণে যৌন হয়রানির শিকার হয় শতকরা ২৫ জন। শতকরা ২০ জন প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। অতএব যৌন হয়রানির কারণ একাধিক। তবে, অশ্লীল পেশাক পরিধান ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এর পেছনে মুখ্য দায়ী। এছাড়া নৈতিক শিক্ষার অভাব। পারিবারিক শিক্ষার অভাব। সহজলভ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অশ্লীল চলচ্চিত্র এবং পোস্টার প্রদর্শনী যৌন হয়রানির পেছনে কম বেশী দায়ী।

সারণি-৫

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ভুক্তভোগীদের সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য

প্রতিরোধে পদক্ষেপ	গণসংখ্যা ঘ=১০০	শতকরা
বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ	২৯	২৯%
নতুন আইন প্রণয়ন	১৪	১৪%
বোরকা পরা/ইসলামী অনুশাসন	২০	২০%
সচেতনতা বৃদ্ধি করা	১৬	১৬%
সরকার প্রণীত আইনের কঠোরতা	৭২	৭২%
অন্যান্য	৭	৭%

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, শতকরা ৪২ জন উত্তরদাতা সরকারের প্রণীত আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে মতামত প্রদান করেছে। তাই ইসলামী অনুশাসন পালনের প্রতি শতকরা ২০ জন উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছে। এছাড়া শতকরা

২৯ জন বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে মতামত প্রদান করেছে । আবার শতকরা ১৬ জন সচেতনতা বৃদ্ধি করার কথা বলেছে ও শতকরা ১৪ জন মেয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা বলেছে । প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শতকরা ৬৩ জন উত্তরদাতা বিদ্যমান আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না। এক্ষেত্রে আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি খুবই দরকার। তবে এর মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটা হলো বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ। প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা যাবে।

বুক রিভিউ

احكام السجناء وحقوقهم فى الفقه الاسلامى
আহকামুস সুজানা ওয়া হুকূকুহুম ফীল ফিকহিল ইসলামী
(ইসলামের কারা আইন ও কারাবন্দিদের অধিকার)

গ্রন্থটির পূর্ণ নাম-احكام السجناء وحقوقهم فى الفقه الاسلامى "আহকামুস সুজানা ওয়া হুকূকুহুম ফীল ফিকহিল ইসলামী" (ইসলামী আইনে কারা আইন ও কারাবন্দিদের অধিকার)।
লেখক মুহাম্মদ রাশেদ আল-উমর। প্রথম প্রকাশ : ২০১০ইং, প্রকাশক : দারুন নাওয়াদের, সিরিয়া-লেবানন। পৃষ্ঠা-৫৮৬, বোর্ড বাইন্ডিং, সাইজ-রয়েল, কাগজ-অফসেট, মূল্য- উল্লেখ নেই। এটি দামেশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধীন উসূলুল ফিক্হ বিভাগের প্রফেসর ড. হামাওয়ীর তত্ত্বাবধানে রচিত একটি গবেষণাপত্র।

এটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন প্রখ্যাত ফকীহ ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী ও ড. মুহাম্মদ হাসান আল-বাগা। তাঁদের পর্যালোচনা শেষে এটি জায়্যিদ জিদ্দান (অতি উত্তম) মানে উত্তীর্ণ হয়। এটি ১৪২১ হি. মোতাবেক ২০০১ ঈ. সনে অভিসন্দর্ভরূপে গৃহীত হয়। পরে এটি ১৪৩১ হি. মোতাবেক ২০১০ ঈ. সনে দামেশকের অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবা 'দারুন নাওয়াদির' থেকে প্রকাশিত হয়। একাধিক সূচীসহ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮৬। বইটির রেজিস্ট্রেশন (ISBN) নং- ৯৭৮-৯৯৩৩-৪১৮-২০-৫।

মুসলিম বিশ্বের পরিচিত ব্যক্তিত্ব, জামিয়া দামেশ্কের ফিক্হ ও মাযহাব বিভাগের প্রধান ড. ওয়াহবা আয্-যুহাইলী ছিলেন এ অভিসন্দর্ভ পর্যালোচনার প্রধান। তিনি এটির সপ্রশংস মন্তব্য করেন।

তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য–
"এ গবেষণায় গবেষকের অসামান্য কীর্তি হল কারাবন্দিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মৌল নীতিমালার গঠনপ্রণালী উপস্থাপন। এটি উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে উল্লিখিত বিষয়াদিতে কারাবন্দিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে একটি সফল আইন হিসেবে গণ্য হতে পারে। এটি একটি উচ্চাঙ্গের কাজ।"

"এটি এমন গবেষণাপত্র, যা ইসলামের দৃষ্টিতে কারাগারের বিভিন্ন বিষয় ও বন্দিদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত মানুষের বিভিন্ন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক লক্ষ্য প্রমাণ করেছে, যেগুলো এই সংক্রান্ত শরয়ী বিধানের মৌলিকত্ব বা এর বিভিন্ন দিক বর্ণনার সাথে যুক্ত। এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সহায়তা নেওয়া হয়েছে বিগত ফকীহদের মাঝে প্রচলিত বিষয়াদির বা খুলাফায়ে রাশেদীনের কারো কারো মাঝে প্রচলিত বিষয়াদির। এ খলীফাগণের অন্যতম হলেন পঞ্চম খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয রহ.।"

ড. ওয়াহাবা আয-যুহাইলী তাঁর মন্তব্যের ইতি টানেন এভাবে–"সবকিছু মিলিয়ে এই অভিসন্দর্ভ একটি উত্তম রচনা। এর জ্ঞানগর্ভ রচনা শৈলী সুস্পষ্ট। এতে রয়েছে অনেক তথ্য ও উপকারী প্রস্তাব।"

বর্তমান বিশ্বে আইনব্যবস্থার অবনতি ও চারিত্রিক ধসের একমাত্র বিদিত শাস্তি হয়ে গিয়েছে কারাদণ্ড। কারাদণ্ডের বিভিন্ন প্রকার হওয়া সত্ত্বেও কারাগার-ই কি মানব চরিত্র সংশোধনের একমাত্র পথ? এ ছাড়া অন্য কোন পথ কি আমাদের সামনে নেই? একাধিক সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতকারীকে একসাথে রাখা হলে তাতে কি মৌলিকভাবে সমাজের কোন উপকার রয়েছে বা তাদের মানসিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে?

লেখক এ গ্রন্থে এসব প্রশ্ন তুলেছেন খুব জোরালো ভাবে। এরপর তিনি এগুলোর সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন।

তিনি বলেছেন, ইসলাম যেহেতু সদা সচল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি দীন, যেহেতু সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে তার স্পষ্ট নির্দেশনা, সুতরাং বর্তমান কারাব্যবস্থা নিয়ে অবশ্যই ইসলামের স্পষ্ট ও কার্যকর নির্দেশনা থাকবে। সে নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বর্তমান কারাব্যবস্থার সমস্যাদি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন।

এই অভিসন্দর্ভ তৈরিতে তিনি প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটেছেন এবং আকরগ্রন্থগুলোতে আলোচ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করেছেন। ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী এ বিষয়টিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

যে কোন লেখকের জন্যে এটি প্রশংসার বিষয়, তিনি আলোচনা করতে গিয়ে আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত নতুন ও পুরোনো সকল গ্রন্থ মন্থন এবং প্রাচীন গ্রন্থের সাথে বর্তমান গ্রন্থের যোগসূত্র স্থাপন করবেন। কারণ এটি তার জ্ঞান প্রাজ্ঞতা, উপস্থাপনা যোগ্যতা এবং জ্ঞানব্যাপ্তির নিদর্শন বহন করে।

একইভাবে তিনি সহযোগিতা নিয়েছেন এমন কিছু গ্রন্থের, যেগুলোতে রচয়িতাগণ নিজ নিজ দেশের কারাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবনা এনেছেন এবং উপর্যুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে বিপুল তথ্যসম্ভারে এ পুস্তকের উপযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বইটির উদ্ধৃতি সম্পর্কে একটি আলোচনা খুবই সঙ্গত মনে হচ্ছে। তা এই, ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে তাত্ত্বিক আলোচনায় যে কোন তথ্য বা বক্তব্য তথ্যের প্রাচীনতম মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি বা বক্তার নিকটতম বা স্বরচিত গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করা উচিত। যে বিষয়ের আলোচনা সে বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি না দেওয়া যে গবেষণা শৈলীর পরিপন্থী–তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্মানিত লেখক যদিও অধিকাংশ আলোচনায় অসংখ্য তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উপরে উল্লিখিত মূলনীতি অনুসরণ করতে পারেন নি। একটি গবেষণাগ্রন্থে এমনটি না হওয়াই সঙ্গত ছিল।

অবশ্য তিনি একই বিষয়ের একাধিক সূত্র দিয়েছেন। ব্যাপক উদ্ধৃতি দেওয়ার উপকার হলো, প্রয়োজনে যে কোন আলোচনা সম্পর্কে পাঠক সে আলোচনার আকরগ্রন্থ অনুসন্ধান করে

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারেন। তাছাড়া একাধিক উদ্ধৃতি আলোচ্য বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণ করে, যদিও কখনো কখনো অনেক উদ্ধৃতির মূলে থাকে একটি সূত্র। একজন একটি কথা বললেন, দ্বিতীয়জন তার বরাতে বললেন। এরপর তৃতীয়জন দ্বিতীয় জনের বরাতে বললেন। এভাবে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি যদি পাঁচটিও হয়; মূলত তা কিন্তু একটি।

বইটিতে লেখক তাঁর আলোচনা একটি ভূমিকা, ছয়টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে সাজিয়েছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে অসংখ্য অনুচ্ছেদ। তন্মধ্যে ভূমিকাতে আলোচনা করেছেন, ১. আলোচ্য বিষয়টি বেছে নেওয়ার বিভিন্ন কারণ; ২. আলোচনার নকশা ও পরিকল্পনা; এবং ৩. আলোচনার পদ্ধতি।

তিনি প্রথম অধ্যায়ে কারাগার ও তার আইনসম্মত ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনায় তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে, ১. ইসলামী শরীয়া ও আইনের দৃষ্টিতে কারাদণ্ড; ২. কারা আইনের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ; এবং ৩. কারাদণ্ড ও সমাপ্তির বিবিধ কারণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ : এখানে তিনি কারাগার সংক্রান্ত বর্তমান ধারণা, ইসলামের দৃষ্টিতে কারাগারের অবস্থান এবং এ ব্যবস্থার ক্ষতিকর ও নিন্দাযোগ্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এখানে তিনি আলোচনা করেছেন বিশ্বব্যাপী কারাব্যবস্থার অস্তিত্ব ও রূপ, ইতিহাসে এর অবস্থান। প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে সিরিয়ায় কারাদণ্ডের কার্যকারণ ও রূপসমূহ। অবশ্য পুরো গ্রন্থেই বিভিন্ন জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে সিরিয়ার আইনের আলোচনা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে তাওবা ও ভাল হওয়ার দৃপ্ত শপথের মাধ্যমে কারাদণ্ড রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনের অবস্থান নিয়ে। এ পরিচ্ছেদে তিনি অতি চমৎকার একটি আলোচনা করেছেন, যার শিরোনাম- কারাদণ্ড কি অপরাধীর জন্যে শরয়ী কাফফারা হতে পারে? এ শিরোনামের আলোচনাটিকে খুব চমৎকার ও উপযোগী আলোচনা বলতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন কারাবন্দিদের বিবিধ অধিকার সম্পর্কে। এখানে তিনি আলোচনা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছেন, ১. কারাবন্দিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা; ২. বিচার ও শুনানিকালে বন্দির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে তার দাবি ও অধিকার; ৩. ইবাদত ও শা'আইর পালনে বন্দির অধিকার; এবং ৪. আত্মীয় ও পরিচিতজনের সাথে দেখা সাক্ষাতের অধিকার।

প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের প্রাপ্য দেয়া ও আচরণের ক্ষেত্রে মৌলিক ও কার্যকর বিষয়গুলো। মোট আটটি বিষয় রয়েছে এই আলোচনায়, যার প্রত্যেকটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তিনি প্রস্তাবনারূপে বন্দীদের অধিকারের একটি সংজ্ঞা পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে শুনানি, আপিল ও জনসমক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনার পর তিনি আলোচনা করেছেন নিরপরাধ অভিযুক্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে।

ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত মূলনীতি, শরীয়া ও আইনের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বৈধতা, পন্থা ও পরিমাণ সম্পর্কে তিনি, জ্ঞানগর্ভ ও উপযোগী আলোচনা করেছেন।

এ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে তিনি বলেন, "এই আলোচনার মূলকথা হলো, আমার মতে অভিযুক্ত বন্দি নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক, বন্দী করার কারণে তার যে ক্ষতিগুলো হয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে। তবে এ ক্ষতিপূরণ হতে হবে ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে ইসলামী শরীয়া ব্যক্তির অধিকারকে সমষ্টির অধিকার লক্ষ্য রাখার মতই লক্ষ্য রেখেছে। শরীয়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে দু'টি অধিকার-ই রক্ষা করা হবে।"

"এটা ঐ সময়, যখন অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্যে শরীয়ত নির্ধারিত সময়সীমার অতিরিক্ত সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী রাখা হয় এবং বিচারক সংশ্লিষ্টরা মামলা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে ত্রুটি করে; ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তির আটকাবস্থা দীর্ঘ হয়। পাশাপাশি উপার্জন অক্ষম বানিয়ে রাখার কারণে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। সাথে সাথে তার যে মানসিক ক্ষতিও হয় তা হচ্ছে, নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও তার অভিযোগ স্পষ্ট করার বিষয়ে বিচার সংশ্লিষ্টদের ত্রুটি থাকার দরুন তাকে আটকে থাকতে হয়। তাছাড়া আটক ব্যক্তি দূরে থাকার ফলে তার পরিবারের যে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটে. তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষত যদি পরিবারের সদস্যদের ব্যয়ভার এ ব্যক্তিই নির্বাহ করে।" (পৃ. ১৬৬-১৬৭)
তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইবাদত ও শা'আইর পালন করা সংক্রান্ত আলোচনায় অপরাধীকে একজন মুসলমান বিবেচনা করে প্রদত্ত প্রাপ্যগুলো প্রদানের প্রস্তাব করেছেন তিনি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ১. অভিযুক্ত বন্দি স্বামী যদি স্ত্রীকেও বন্দি করার দাবি করে, আদালত কী করবে? ২. স্ত্রীকে আটক করা হলো। স্বামী তার কাছে যেতে চাচ্ছে, আদালত কী করবে?

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'কারাবন্দিদের সাথে আচরণ'। এ অধ্যায়ে পরিচ্ছেদ রয়েছে তিনটি। এ পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে যথাক্রমে ১. কারাবন্দিদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ; ২. কারাবন্দিদের প্রতি মনোযোগ ও দৃষ্টিপ্রদান; এবং ৩. কারাবন্দিদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, অপরাধ ইত্যাদি মোট কতভাবে কতভাগে বিভক্ত করে অভিযুক্ত আসামীদেরকে জেলখানায় রাখা যায়।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নাতিদীর্ঘ আলোচনার বিষয় হলো, কারাবন্দির সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং কারাগার বাস উপযোগী ও পরিচ্ছন্ন হওয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনার বিষয় কারারক্ষীদের দায় সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে তাঁর আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়, কারাবন্দিদের সুস্থতা, স্বাভাবিক অবস্থা ও আরাম এবং নিপীড়িতের

আত্মপক্ষ সমর্থন– মোদ্দাকথা কারাবন্দিদের উপযোগী শাস্তি প্রদানে কারারক্ষীদের ভূমিকাই- আদালতের পর-সর্বাগ্রে। তাই তাদের বিশ্বস্ত, সৎ, বিচক্ষণ, সবল, সজাগ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হওয়া জরুরি।

এর পাশাপাশি তিনি আলোচনা করেছেন কারারক্ষীদের বেতন-ভাতা নিয়ে। বেতন-ভাতা কোন পক্ষ বহন করবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত উল্লেখ করার পর তিনি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্টের দিকে ইশারা করে বলেন, কারারক্ষীর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক তার প্রয়োজন পূরণের উপযোগী হওয়া উচিত, যেন সে বন্দিদেরকে অর্থ উপার্জনের খাত না বানায়।" (পৃ. ২৯৮)

এ পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কারাবন্দিদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও শাস্তি প্রদান। এখানে তিনটি পরিচ্ছেদে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : ১. কারাবন্দিদের শাস্তিপ্রদান এবং এর কার্যকারণসমূহ; ২. শাস্তিপ্রদানের মাধ্যম ও ব্যবস্থা; ৩. শাস্তিপ্রদানে বিধিনিষেধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ : শাস্তিপ্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায়, শাস্তি প্রদানের কার্যকারণ আলোচিত হয়েছে। সবাইকে এক শাস্তি দেওয়া যায় না এবং শাস্তিপ্রদানে সীমা অতিক্রম করা যায় না। হুদূদ ও বড় তাযীর ছাড়া ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করতে পারে এমন কোন শাস্তি-ই ইসলাম সমর্থন করে না।

এক্ষেত্রে তার অভিনব আলোচনা ছিলো রিমান্ড সংক্রান্ত। বিভিন্ন মত উল্লেখ করে সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেন তা হলো– "আমার মতে অগ্রগণ্য হল অভিযুক্তকে শাস্তি না দেওয়া, যতক্ষণ না চারপাশের অবস্থা ইঙ্গিত করে যে, অভিযুক্ত দোষে সে দোষী। বিশেষত হত্যা ও বড় ধরনের চুরি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে।" (পৃ. ৩২৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শাস্তি প্রদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গের পূর্ণ বা অর্ধেক নষ্ট করা, ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দেওয়া, সূর্যের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা প্রচণ্ড উত্তাপ দিয়ে নির্যাতন করা–এগুলোর কোনটিই ইসলাম সমর্থন করে না। এমনকি শাস্তি প্রদানকালে গালিগালাজও ইসলামে নিষিদ্ধ।

তবে এক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতাকে বিবেচনা করেছে ইসলাম। যেমনটা লেখক ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন–"সারকথা হলো, সাধারণভাবে কারাবন্দিকে শাস্তি দেওয়া বৈধ নয়। তবে বিচারক যদি মনে করেন, কেবল আটক রাখা তাকে অপরাধ থেকে ফেরানো বা বিরত রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, তাহলে বিচারকের অধিকার রয়েছে তার জন্য শাসনমূলক লঘু শাস্তি নির্ধারণ করা, যেগুলো দ্বারা উপরিউক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। তবে নির্ধারিত এই শাস্তি হতে হবে লাঞ্ছনামূলক সকল আচরণ বাদ দিয়ে, মনুষ্যত্বের সামান্য অমার্যাদা না করে। এই শাস্তির পরিণতি এমন ক্ষতিকর হবে না, যার ফলে অঙ্গহানি বা জীবনের ঝুঁকি হতে পারে। শরীয়া অনুযায়ী এই শাস্তি বৈধ হতে হবে। এই শাস্তি বাস্তবায়নের প্রস্তাবদাতা হবেন বিচারক নিজেই অথবা এ বিষয়ে দক্ষযোগ্য ব্যক্তি। আইনে তার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। " (পৃ. ৩৬৭)

লেখক পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন 'কারাবন্দিদের ইবাদত-বন্দেগী করার অধিকার, ধর্ম পালনের অধিকার এবং আর্থিক লেনদেনের অধিকার'। এ অধ্যায়ে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ; যেগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে : ১. বন্দির পবিত্রতা অর্জন এবং নামায আদায়ের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান; ২. রোযা ও যাকাত প্রদানের বিধিবিধান; ৩. কারাবন্দির হজ্জ পালনের সাথে সম্পর্কিত বিধান; এবং ৪. লেনদেন ও আর্থিক আদান-প্রদান সম্পর্কিত বিধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, কারাবন্দিদের সার্বিক অবস্থা এবং তাদের ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কে। এখানে পরিচ্ছেদ রয়েছে তিনটি। সেগুলোতে লেখক আলোচনা করেছেন :
১. কারাবন্দির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিধিবিধান; ২. কারাবন্দির উপর বলপ্রয়োগ এবং তার কসম সংক্রান্ত আলোচনা; ৩. কারাবন্দির কারাগারে কৃত অপরাধ এবং তাদের সাক্ষ্য ও বিচার নিয়ে আলোচনা।

এ অধ্যায়ে কারাবন্দির ব্যক্তিগত কার্যক্রম ও কার্যক্ষমতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে আছে কারাবন্দির বিবাহ, তালাক ও বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় 'কারাবন্দির অনিচ্ছাকৃত তালাক, বিবাহ, কসম, লেনদেন ইত্যাদির বিধান?

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে কারান্তরীণ অবস্থায় কারাবন্দীদের অপরাধ সংঘটন এবং কারান্তরীণ অবস্থায় আটক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার বিধান নিয়ে আলোচনা। এখানে যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা হল মৃত্যুর কারণে আটক ব্যক্তির ঋণ বা অপরাধ কি মাফ হয়ে যায় অথবা মৃত্যুহেতু বাদীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে কিনা। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আলোচিত হয়েছে নিপীড়িত অবস্থায় কারা অভ্যন্তরে আসামীর মৃত্যু হলে এই মৃত্যুর বিধান।

এই অধ্যায়ে আরো আলোচিত হয়েছে, আটকদের পরস্পরের সাক্ষ্যগ্রহণ, আটক ব্যক্তিকে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত করা এবং তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মামলার রায় ঘোষণা ইত্যাদির বিধানাবলী। পরিশিষ্টে লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্য আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু সিদ্ধান্ত ও কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন।

এই গবেষণায় সম্মানিত লেখক জ্ঞান-গভীরতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিটি আলোচনার শেষে তিনি সে আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন। তাতে পুস্তকটির উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং পুস্তকটিতে মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এটি যোগ না করলে বইটি নেহায়েত একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেই থেকে যেত। তাছাড়া এটি এরও দলীল যে, তিনি বইটির আলোচ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখেন। সাধারণত এমন ব্যক্তিদের রচনা সফল ও সার্থক হয়।

-মুহাম্মদ যুবায়ের

সাবেক মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহী

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজি: নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., পরিচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।

(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।

(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।

(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ ....

....

বয়স .... পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-
⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-
⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REG. NO. DA-6100 : ISLAMI AIN O BICHAR : JANUARY - MARCH : 2014